ডি এম লাইব্রেরী
কলকাতা

প্রকাশক :
গোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
কলিকাতা

মুদ্রাকর :
ভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য : আড়াই টাকা

শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

কৈশোর

ক' মাস ধরে মা'র এত অসুখ যাচ্ছে যে বাবলু ইচ্ছা করে তাকে কিছু বলে না। তার রাফ খাতা অঙ্ক খাতা ফুরিয়ে গেছে। কাগজের দরকার। কলমের নিবটা সেদিন মেঝেয় পড়ে বেঁকে গেছে। একটা নিব না হলে চলছে না। কাগজ কলম ব্যাগ ছাড়াও আরো এমন সব জিনিসের দরকার হয় যেগুলোর অভাব দশ বছরের বাবলু বেশ করেই অনুভব করে। কিন্তু করলেও সে চেপে যায়। আজকাল আরও বেশি চেপে যাচ্ছে। তার তিনটে শার্ট এখন একটায় এসে ঠেকেছে। জুতো ছিঁড়ে গেছে। ছেঁড়া জুতো পরেই স্কুলে আসছে। মাথার চুল বড় হয়েছে। কিন্তু, কিন্তু এ সবের জন্য বাবলু মন খারাপ করে না। একটুও খাবাপ করে না। যেন একটু একটু করে মনটাকে শক্ত করতে করতে এখন সে ভালরকম শক্ত করে ফেলেছে। আবার তার ব্যাগ হবে, জামা হবে, নিয়ম করে ফি মাসে কানাইর সেলুনে গিয়ে চুল ছাঁটতে পারবে যদি মা ভাল হয়ে ওঠে। কিন্তু মা কি ভাল হবে। এখানেই বাবলুর সব ভাবনা সবটা ভয়। আর মার অসুখ নিয়ে আজ ক'টা মাস বলতে গেলে এই একটা বছরই বাড়িতে কি অশান্তি যাচ্ছে বাবলু চোখের ওপর দেখছে। মার শরীর কোনোদিন বেশ ভাল ছিল এটাও অবশ্য বাবলু মনে করতে পারে না। সেবার সে যখন ক্লাস থ্রি'তে পড়ে মার প্লুরিসিস হয়। তাই নিয়ে বাবার কি রাগারাগি। 'এখন কে তোমার শুশ্রূষা করে। আমাব পাঁচজন আত্মীয় আছে? না আমি অফিস কামাই করে বাড়িতে বসে থাকব। না যাট টাকা বাড়ি ভাড়া আর খাওয়ার খরচ চালিয়ে একটা অল টাইমের জন্যে ঝি চাকর রাখা সম্ভব?' বাবা বলছিল বাবা বলত। বাবলুর মনে আছে। মা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছলছল চোখে চেয়ে থাকত। আর সে,—মার কথামত প্রায় তিন সপ্তাহ স্কুলে যায়নি। মিকশ্চার ঢেলে দেওয়া, জলের গ্লাস এগিয়ে দেওয়া, কমলা লেবুর খোসা ছাড়িয়ে কোয়াগুলো মার হাতে তুলে দেওয়া ইত্যাদি ছোটখাটো কাজগুলো বাবলু অপটু

হাতে যতটা সম্ভব করত। মা এতে খুব খুশিই হত। আব অবাক হয়ে বাবলু ভাবত এখনও ভাবে বাবা একদিনও অফিসে ছুটি নিলে না। এ নিয়ে মা বাবলুর সঙ্গে কোনোদিন একটা কথাও বলেনি এ কথাও বাবলুর বেশ মনে আছে। শুধু দেয়ালে চোখ রেখে মা চুপ করে ভাবত। একটু সুস্থ বোধ করলে বাবলুকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে তার মাথায় চুলে হাত বুলিয়ে দিত। 'তুমি বড় হও, তুমি ভাল করে লেখাপড়া শেখ, তবেই আমাব কোনো দুঃখ থাকবে না।' মার কথা শুনে বাবলুব ভীষণ কান্না পেত, কিন্তু কাঁদেনি।

গত বছর গেছে পেট খাবাপ। কিছুই খেযে হজম কবতে পাবত না মা। পেট খারাপেব পব থেকেই তো শবীব আরো বেশি ভেঙ্গে গেছে। ফরশা মানুষ। শুকিযে হাত পা মুখ যেমন নীলচে রং ধবেছে! 'চমৎকার একখানা স্বাস্থ্য দিয়ে পাঠিয়েছে ঈশ্বব তোমাকে।' এমন দিন নেই যে বাবা বলত না। 'তুমি তো ভোগছ না, ভুগছি আমি।' বস্তুত বাবার যে কষ্ট হয়, তা বাবলু বোঝে। নিযমমত অফিসেব বান্না নামানো হয় না। ঘর গোছানো, এটা ওটা পবিষ্কাব করা, বিছানা পাতা, মশারী খাটানো, সংসারের কত রকমেব কাজ বাকি থাকে। কিন্তু—

ঠিকে ঝি আর কতটুকুন করে বা কবতে পাবে।

আর এবার তো দেখা যাচ্ছে মা বিছানা থেকেই উঠতে পারছে না। রোজ জ্বর হয়, বুকে ব্যথা আছে। মাঝে মাঝে কাসছে। ডাক্তার আসে। এবার বাড়িতে ডাক্তাব ডেকে আনতে বাবা ত্রুটি করেনি। কিন্তু অবাক হয়ে গেছে বাবলু বাবাব একেবাবে চুপ হযে যাওয়া দেখে। 'তুমি ভুগছ না আমি ভুগছি ···কে তোমাব শুশ্রূযা করে....ভাল লাগে না রোজ ডাক্তারেব বাড়ি ছোটা···তোষক বালিশ রোদে দেওয়া হচ্ছে না···' একটা কথা না। একদিন না। গম্ভীর। বাবা এত বেশি গম্ভীর হয়ে গেছে দেখে বাবলুব আরো বেশি খারাপ লাগছে। বাবার মুখের দিকে তাকাতে ভয় করে তার। মা-ও কি ভয় পেয়ে গেছে? অসুখের জন্য? অসুখ তো লেগেই আছে।

বাবলুর মনে হয় বাবার সব সময় গম্ভীর থাকা দেখে মা ভয় পাচ্ছে। এবারের অসুখে শুশ্রূষার তেমন দরকার হচ্ছে না যদিও মার। কিন্তু তা হলেও আগের মত মা বাবলুকে কাছে ডাকছে না। কোলের কাছে বসতে গেলে বসতে দিচ্ছে না। 'তুমি ততক্ষণ বসে একটু পড়াশোনা করো।' মা বলে। 'এখন স্কুলের পড়া বেড়েছে।' বাবলু হতাশ হয়ে তার পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে। আর আশ্চর্য, মার চোখে তো এবার সে একদিনও জল দেখল না। চোখ দুটো যদিও খুব বেশি গর্তে ঢুকে গেছে। কিন্তু তা বলে কি একবারও চোখ ছলছল করবে না। এত শুকিয়ে গেছে? দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকাটা আগের মত আছে। কিন্তু—

মা চুপ, বাবা চুপ, সবটা বাড়িই চুপ। ঘড়ির কাঁটা ধরে ঝি আসে। কাজ সেরে আবার চলে যায়। বাবার অফিসে বেরোনোর সময়ের নড়চড় নেই। বাবলুর স্কুলে যেতে ইচ্ছা করে না। ইচ্ছা হয় তার আগের বারের মত দু-তিন সপ্তাহ স্কুলে ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকে। কিন্তু মা চাইছে না। 'কত আর ছুটি নিবি। আমার তো অসুখ লেগেই আছে।' শুনে বাবলু আর ছুটির কথা বলে না। তবে একটা জিনিস এখন নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। বাবা যেমন গম্ভীর হয়ে গেছে তেমনি বেশ রাত করে বাড়ি ফেরে। আগে এটা মাঝে মাঝে হ'ত। তারপর ঘন ঘন। এখন রোজ। রাত দশটা এগারোটা বারোটা বেজে যায় ফিরতে। বাবলু কোনোদিন জেগে থাকে কোনোদিন ঘুমিয়ে পড়ে। কোথায় থাকে কোথায় যায় বাবা বাবলু জানে না। মাকে সে প্রশ্ন করেনি। প্রশ্ন করলে মা কি উত্তর দেবে বাবলু জানে না। কেবল এইটুকুন সে বুঝেছে মার সম্পর্কে বাবার মন যেন কেমন ছাড়া-ছাড়া হয়ে যাচ্ছে। তেমনি বাবার সম্পর্কে মার মন। বাবলুর মন তাতেই আরো বেশি খারাপ লাগে। যেন আগেই ভাল ছিল। অফিসে যাবার আগে সারাটা সকাল বাবার রাগারাগি, অফিস সেরে

সন্ধ্যাসন্ধি বাড়ি ফিরে রাগারাগি হৈ-চৈ। 'এভাবে কি দিন চলে। আমার লুঙ্গি কোথায়। এখন পর্যন্ত একটু চা পেলাম না। না, আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। ঘরের বৌ যদি বারো মাস অসুখ হয়ে পড়ে থাকে, তবে মানুষ বাঁচে কি করে।' মা চোখের জল ফেলতো। বিছানা ছেড়ে উঠে রোগা শরীরটা টেনে টেনে উনুনের কাছে যেতো। বাবার রাগ আরো বাড়ত তখন। প্রায় পাঁজাকোল করে মাকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে নিজেই কেটলিতে জল ভরে উনুনের ধারে গিয়ে বসত। আগের ঝির উনুন ধরিয়েই ছুটি ছিল। এখন অবশ্য বারো টাকা দিয়ে ঝি রাখা হয়েছে। সে রান্নাও করে। কী বিশ্রী রান্না! খেতে বসে রোজ বাবলুর মনে হয়। কিন্তু তা হলে কি হবে। রান্না করার জন্য ঝি রাখতে যে বাবা রাজী হয়েছে এতেই সে খুব খুশি। কিন্তু এখন আর বাবা ঠিক সন্ধ্যাসন্ধি বাড়ি ফেরে না। অথচ এখন এলেই চা পেত। শোভার মা বাবুকে চা করে দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। ওটাও তো একটা রান্নার কাজ। মা একটু কড়া কবে বললেই হয়ে যায়। কিন্তু—

সন্ধ্যাবেলা বাবা চা না খেয়ে পারে না। কিন্তু কোথায় খায়? বাবলু রোজ ভাবে। রেস্টুরেণ্ট? কত বড় রেস্টুরেণ্ট? বাবলুদের স্কুলের উল্টোদিকে একটা চায়েব দোকান আছে। দোকানের ভিতরটা এত নোংরা যে দেখলে গা ঘিনঘিন কবে। লাখ লাখ মাছি সারাক্ষণ ভন্ ভন্ করে ঘুরছে! এরকম দোকানে এমন নোংরা বেঞ্চিতে বসে চা খেতে বাবার মন বসবে না বাবলু খুব আন্দাজ করতে পারে। বাড়িতে থালা গ্লাসে একটু দাগ দেখলে সেগুলো একটু কম ধোয়া হলে বাবা এমন রাগ করে। হয়তো বাবার অফিসের কাছে বড় রেস্টুরেণ্ট আছে। এ-পাড়ায় বড় রাস্তার ওধারে যেমন একটা ভাল রেস্টুরেণ্ট আছে। বাবলু চা খায় না। লিভার খারাপ বলে মা তাকে চা অভ্যাস করতে দেয় না। কিন্তু বাবলুর

খুব ইচ্ছা করে একদিন বড় রেস্টুরেণ্টটায় গিয়ে একটা ব্রেস্ট কাটলেট খায়। ইচ্ছাটা সব সময় হয় না, মাঝে মাঝে হয়। কিন্তু এখন বাড়ির যেমন অবস্থা তাতে ইচ্ছাটাকে সে বেশি মনে হতে দেয় না। চেপে রাখে। যেমন এখন। কেবলই তার মার অসুখ, মার চুপ করে দেয়াল মুখ করে শুয়ে থাকা, বাবার গম্ভীর মুখ, তার অনেক রাত করে বাড়ি ফেরার কথা মনে হয়।

গলি পার হয়ে সে বড় রাস্তায় পড়েছে কি পুরোনো লোহা টিন বোঝাই একটা ভারি লরী প্রায় তার কান ঘেষে ছুটে গেল। আর একটু অন্যমনস্ক হলে সে চাপা পড়ত। তাদের স্কুলের দপ্তরীর ছোট ছেলেটা যেমন সেদিন চাপা পড়ে মরল। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মারা গেল। বাবলুর বুকটা ঢুবঢুব করছিল। দাঁড়িয়ে সে দুটো ট্যাক্সি, একটা ঘোড়ার গাড়ি, এমন কি রিক্সাটাও সরে না যাওয়া পর্যন্ত রাস্তা পার হতে সাহস পেল না। রাস্তা একেবারে ফাঁকা হতে সে আবাব হাঁটতে লাগল। সোমেন বিনয় ওবা যেদিকে গেছে বাবলু তার উল্টোদিকের পথ ধরে এগোয়। একটু সকালে ছুটি হয়েছে বলে ওরা এখন কোথায় যাবে বাবলু জানে। ছাব্বিশ নম্বরের বাড়ির পরেই উড়ের সেই হোটেলের পাশ দিয়ে যে গলিটা গেছে সেই গলি ধরে ওরা সোজা মল্লিক-বাবুদের বাড়ির পিছনের ধোপার মাঠটায় গিয়ে ফুটবল খেলবে। মাল্লকদের সেজো ছেলে মানিক সোমেনের বন্ধু। মানিক নতুন বল কিনেছে। বাবলু একদিন মোটে খেলতে গিয়েছিল সেখানে। আজও সোমেন তাকে সাধাসাধি করেছে ক্লাসে। কিন্তু বাবলুর ইচ্ছা করে না। কেন খেলতে ইচ্ছা করে না সে অবশ্য সোমেনদের বলেনি। কোঁনোদিনই সে কাউকে বলছে না তার মন খারাপ কেন, সে এমন চুপচাপ আলাদা হয়ে থাকে কেন। বললে তারা বুঝবে না। বাবলু ভাবে। তা ছাড়া সব কথা বলাও যায় না। মার অসুখের কথা ওরা বুঝবে, বাবার রোজ রাত বারোটায় ঘরে

ফেরা ওরা বুঝবে, কিন্তু তার বাবা আর মার মধ্যে কথা বন্ধ হয়ে গেছে এ যেন—

বাবলুর চোখ দুটো আবার ছলছল করে উঠল। পা দুটো যেন ভারি হয়ে গেছে। যেন অনেক কষ্টে সে হাঁটছে। আজ সকালে তার পাতলা পায়খানা হয়েছে। কিন্তু মাকে বলেনি। যেন মা ও বাবার কাছ থেকে সে চুপ করে থাকা শিখছে। পেট খারাপ কি মাথা কনকন কি সর্দিটর্দি হয়েছে টের পেলেও আগের মতন আর হুটহাট মাকে বলছে না। পরশু দিন মাছের ঝোলে এত বেশি লঙ্কা দিয়েছিল শোভার মা যেন বাবলুর জিভ পুড়ে যাচ্ছিল, চোখ দিয়ে টপটপ জল পড়ছিল। কৈ মাকে তো সে সে-কথা বলতে পারেনি। আজ পেট খারাপ ছিল বলে দুপুরে সে টিফিন খায়নি। পকেটে দুটো আনি টুং-টাং করছে। যেন এখন তার ক্ষুধা পেয়েছে মনে হচ্ছে। মিষ্টির দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে দু আনার জিলিপি কিনল সে তারপর আবার হাঁটতে লাগল।

কি একলা চুপচাপ বসে জিলিপি খাবে বলে যে সে বড়রাস্তা ছেড়ে তেলকলের পাশের সরু পথটা পার হয়ে খালপারের লাগোয়া নির্জন মাঠটায় হঠাৎ এসে পড়ল তা না। নিরিবিলি বসে কাল সন্ধ্যাবেলার দেখা সেই ছবিটা আবার ভাল করে মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখবে বলে কখন থেকেই তার ভীষণ লোভ হচ্ছিল। ক্লাসে বসে সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে ছুটির পর তেলকলের পিছনের মাঠে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে থাকবে আর—

সবটা দৃশ্য সবটা ছবি কাল বাড়ি ফিরে পড়তে বসে বার বার তার মনে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে সে তা ভুলতে পারেনি। আজ সকালে মনে পড়েছে। আর দুপুরে ইংরেজীর ঘণ্টায়। যখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। শঙ্কর গুনগুনিয়ে গান গাইছিল। তাপস কাগজের নৌকো তৈরী করে গলির জলে ছেড়ে ছেড়ে দিচ্ছিল। বাবলুর মন চলে গিয়েছিল তাদের পাশের বাড়িতে

অমলের পড়ার ঘরে। অমলের বাবা মার শোবার ঘরই সেটা। পার্টিশান দিয়ে এক পাশে অমলের জন্য ছোট্ট কামরা তৈরী করা হয়েছে বাবলু এখন অনুমান করতে পারছে। বাবলুর হাইজিন বই কেনা হয়নি। অমল রাধারমণ ইনষ্টিটিউটের ছাত্র হলেও ওর হাইজিন বইয়ের সঙ্গে বাবলুদের হাইজিন বই মিলে গেছে। বাবলুর তাতে সুবিধে হয়েছে। দরকার হলেই সে অমলের বইটা নিয়ে আসে। পড়া হয়ে গেলে ফিরিয়ে দেয়। কাল সন্ধ্যাবেলা বইটা ফিরিয়ে দিতে গিয়ে অমলের সঙ্গে বসে বসে সে একটু গল্প করছিল। তখন —অমল কি দেখতে পেয়েছিল? অমল যেন দেখতে পায়নি। কিন্তু বাবলু যেখানটায় বসেছিল, সেখান থেকে সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল পার্টিশানের ওধারে অমলের মাকে বাবাকে। যেন অমলের বাবা বেশ কিছুক্ষণ হয় অফিস থেকে ফিরেছে। ইজি-চেয়ারে শুয়ে আছে। পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি। অমলের মা ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে এটা ওটা গুছিয়ে রাখছে, সাজিয়ে রাখছে। রেডিওটা একটু সময় খুলে রেখে আবার বন্ধ করে দেয়। একসময় গিয়ে ইজি-চেয়ারের পাশে দাঁড়ায়। হাতলের ওপর শরীরের ভর রেখে নুয়ে অমলের বাবার ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে অমলের বাবার হাতে-ধরা খবর কাগজটার ওপর চোখ রাখে। যেন আঙুল দিয়ে অমলের বাবা কাগজের কি একটা লেখা দেখায়। অমলের মা পড়ে হাসে। ঠোঁট টিপে হাসছিল। পড়া শেষ হতে অমলের মা অমলের বাবাকে কি যেন বলে। অমলের বাবা ঘাড় ফিরিয়ে টেবিলের ঘড়ি দেখে। তারপর কাগজটা পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ায়। অমলের মা হাত বাড়িয়ে আলনা থেকে পেন্টুলন এনে দেয়। যেন একটু ব্যস্ত হয়ে অমলের বাবা লুঙ্গি ছেড়ে পেন্টুলন পরে। অমলের বাবার আণ্ডারওয়্যারটা বেশ ময়লা। বাবলুর বাবা অত ময়লা আণ্ডারওয়্যার পরে কি। ভাবছিল সে তখন। অমল মনোযোগ দিয়ে 'যুগবার্ত্তা' কাগজের ছেলেদের মজলিসের পাতায় তার নামটা খুঁজে বার করতে

ব্যস্ত ছিল বলে সে বাবলুর ঘন ঘন মুখ ফিরিয়ে পাশের কামরার দিকে তাকানো দেখতে পায়নি। অমল মাঝে মাঝে কি যেন প্রশ্ন করছিল, আর বাবলু শুধু হাঁ হাঁ করছিল। অমল ছেলেদের মজলিসের 'নতুন সভ্য' হয়েছে। হ্যাঁ, বাবলুও হবে সভ্য। দু' পয়সার একটা পোস্টকার্ডে বয়স, নাম, বাবার নাম আর ঠিকানা লিখে পাঠালেই হবে। ওদিকে বাবলু দেখছে, অমলের বাবার পোশাক পরা হয়ে গেছে। অমলের মা অমলের বাবার নেকটাই বেঁধে দিচ্ছে। চাবির ছড়া-বাঁধা আঁচলটা কাঁধ থেকে গড়িয়ে মেঝেয় লুটোয়। অমলের বাবা সেটা তাড়াতাড়ি তুলে অমলেব মাব কাঁধে বাখে। অমলের মা আবার ঠোঁট টিপে হাসে। আঁচলটা কাঁধেব ওপব রাখা হয়ে গেলে অমলের বাবা সেই হাতেই অমলেব মার কপালে এসে-পড়া লম্বা বাঁকা চুলটা কানেব পিছনে ঠেলে দেয়। 'একটু সকালে ফিরবে রাত করো না।' বাবলু পরিষ্কার শুনল। 'ভদ্রলোককে পেয়ে গলে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। টালা থেকে ফিরে আসতে আর কতক্ষণ লাগবে।' মোটা গলায় অমলেব বাবা বলছিল। এমন সময়—

কিন্তু সত্যি বলতে বাবলু তো পবিষ্কাব কবে কিছু দেখতে পায় নি। তবে অমলের মা কথাটা বললে কেন : 'আঃ, পাশেব ঘরে ছেলেরা আছে।' আর সেই শব্দটা। যেন পোশাক পরা হয়েছে কিনা দেখতে ওপাশের দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে অমলের বাবা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছে তখন। অমলেব মা-ও সবে গেছে সেখানে। কিন্তু তাতেও কিছু মনে হত না বাবলুর। যদি অমলের মা সঙ্গে সঙ্গে ওকথা না বলত। কথাটা শোনামাত্র বাবলুর বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস করে উঠেছিল। আর সে পার্টিশানের ওদিকে তাকাতে পারেনি। ভয়-ভয় করছিল তার, জল তেষ্টা পাচ্ছিল। তখনই অবশ্য অমলের বাবা বেরিয়ে গেছে। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনেছে বাবলু। আর অমলের মা এসে উঁকি দিয়েছে এ-ঘরে।

'বসে বসে ছুটিতে গল্পই করছিস, পড়াশোনা হবে না?' বাবলু ঘাড় গুঁজে বসেছিল। অমলের মার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পায়নি। যেন সেই কথাটা শুনে ফেলে সে ভীষণ অপরাধ করেছে। বাবলুর উচিত হয়নি ওদিকে কান পেতে থাকা। অমলের সঙ্গে আর একটাও কথা বলা হল না। আস্তে আস্তে উঠে সে বেরিয়ে এসেছে সেখান থেকে। আর বাড়ি ফিরে পড়তে বসে তার কেবল সেই ভাবনা, বিছানায় শুয়ে সেই চিন্তা, সেই ছবি। একটা শব্দ —ছোট্ট একটা কথা—যেন সুতোর মত ক্রমাগত লম্বা হয়ে হয়ে আপনা থেকে তার মাথার ভিতর জড়িয়ে যাচ্ছিল। আর অন্ধকার মশারীর চাঁদোয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে একটার পর একটা ছবি দেখছিল ও। অমলের মা অমলের বাবার টাই বেঁধে দিচ্ছে। অমলের বাবা অমলের মার কপালের চুল সরিয়ে দিচ্ছে। অমলের বাবার পরনে ময়লা আণ্ডারওয়্যার। অমলের মা ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর শরীরের ভর রেখে মুখটা অমলের বাবার ঘাড়ের কাছে নিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে। বাবলু শুয়ে শুয়ে ঘামছিল। কিছুতেই তার ঘুম পাচ্ছিল না। ভাবছিল সে, অমলের বাবার বয়স বেশি। অন্তত দেখতে তাই মনে হয়। কিন্তু অমলের মা যেন বাবলুর মার চেয়ে ছোট। অন্তত দেখতে তাই মনে হয়। তার বাবা তার মা। অমলের বাবা অমলের মা। মা বাবা। স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গ? লিঙ্গ প্রকরণের সূত্রটা তার মনে পড়েছে। নামবাচক কতগুলি শব্দকে পুরুষ বোঝায়, কতগুলি স্ত্রী বোঝায়। সিংহ সিংহী, মানব মানবী, পুত্র পুত্রী। সেদিন ক্লাসে ব্যাকরণের ঘণ্টায় মাষ্টারমশায় যখন একটা একটা ক'রে উপমা বলে যাচ্ছিলেন বিজুটা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছিল। দেখতে পেয়ে মাষ্টারমশায় বিজুকে কী মারটাই না মারলেন। বিজু অত হাসছিল কেন। রাত্রে অন্ধকার বিছানায় শুয়ে থেকে মশারীর ঘোলাটে চাঁদোয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে বাবলু কি যেন একটা কথা মনে করতে

পারছিল না। ছেলে মেয়ে, পুরুষ নারী, রাজা রানী, বাবা মা। যেন কবে কার মুখে সে কি শুনেছিল। অস্পষ্ট ধোঁয়া ধোঁয়া, কে বলেছিল মুখটাও সে মনে করতে পারছিল না। হয়তো কেউ বলেনি। হয়তো কিছুই সে শোনেনি। তবে? পরক্ষণেই বাবলু তার মার কথা ভেবেছে, বাবার কথা। যেমন রোজ ভাবে। মার অসুখ, মা চুপ করে থাকে। বাবা গম্ভীর, বাবা অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে। বাবা মার সঙ্গে কথা বলে না। 'ঈশ্বর ঈশ্বর!' বাবলু ইশ্বরকে মনে মনে ডেকে বলছিল, 'অমলের বাবা আর মার মধ্যে যেমন মিল আছে, বাড়িতে যতক্ষণ আছে দুজনে যেমন কথা বলে তেমনি আমার বাবা আর মার মধ্যে মিল ক'রে দাও, শিগ্‌গির মিল ক'রে দাও।'

এখন একটা কাফেলা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে সে ঘোলাটে আকাশটা দেখছিল। একটা কাক অনেকক্ষণ ধরে গাছের ডালে বসে করুণ চোখে বাবলুর হাতের ঠোঙাটা দেখছে। বাবলু এবার এক টুক্‌রো জিলিপি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলল। কাকটা নিচে নেমে এসে টুক্‌রোটি মুখে তুলে নিয়ে আবার উড়াল দিয়ে গিয়ে ডালে বসল তারপর চোখ বুঁজে ভাঙ্গা জিলিপিটা গিলে শেষ ক'রে ঠোঁটটা ডালে ঘষতে লাগল, ডালটা ঠোকরাতে লাগল। শুকনো লিকলিকে ডালটা কাঁপছিল আর সেই কাঁপুনিটা গাছের সরু কাণ্ড বেয়ে নেমে এসে বাবলুর শিরদাঁড়ায় লাগছিল। বাবলু টের পাচ্ছে। ভাল লাগছিল তার এখন একটু। দুপুরের নিস্তেজ মনমরা ভাবটা যেন এখন কিছুটা কেটেছে। এইমাত্র সে আবার ঈশ্বরকে ডেকেছে: 'ঈশ্বর, আমার বাবা আর মা'র মধ্যে মিল ক'রে দাও। দুজন দুজনের মনে আছে, কারো সঙ্গে কারো কথা নেই, দেখে আমি যে কত দুঃখ পাচ্ছি তুমি কি বোঝ না। আমি পরীক্ষায় ফেল করব, ঠিক ফেল করব, তোমার কি কষ্ট হবে না—ঈশ্বর!'

বেশ কিছুক্ষণ ঈশ্বরকে ডেকে বাবলু সুস্থবোধ করছিল। বৃষ্টি হবে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হ'ল মেঘটা কাটতে শুরু করেছে। ওদিকে গঙ্গা। সূর্য ডোবার লালচে রঙ ধরেছে মেঘগুলোতে। তেলকলের আলোগুলো এর মধ্যেই জ্বলে উঠল। তবে তো আর সন্ধ্যার বাকি নেই। বাবলু কি এখন উঠবে। জিলিপির শূন্য ঠোঙাটা এখনও সে হাতে নিয়ে বসে আছে। ওটা ফেলতে গিয়ে হঠাৎ সে আবিষ্কার করল ছোট্ট একটা টুক্‌রো তলায় আটকে আছে। টুক্‌রোটা তুলে তাড়াতাড়ি মুখে পুরে ঠোঙ্গাটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বাবলুর মুখে কথা সরে না, পা দুটো যেন দরজার চৌকাঠের সঙ্গে আটকে যায়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে তার বাধছে। কিন্তু মা'র ধমক খেয়ে তাকে নড়তে হয়। চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে আস্তে আস্তে সে ঘরে ঢুকল। ঢুকতে বাবা হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল। 'অতক্ষণ কোথায় ছিলে, সেই কখন তো তোমার ইস্কুল ছুটি হয়েছে তাই না?'

বাবার চুমু খাওয়া হয়ে গেলে মুখটা সে সরিয়ে নিয়ে গম্ভীর হয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। যেন খুশির চেয়ে তার অভিমান বেশি হয়েছে।

'ওকি, কথা বলছিস না কেন, ভূতের মতন চুপ ক'রে আছিস। এদিকে আয়।'

মার ডাকে বাবলু খাটের কাছে সরে গেল। বাবা এক পাশে বেতের মোড়ায় বসে আছে। বাবলুর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটি-মিটি হাসছে। না, বাবা এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে বলে না, মার ঘরে মার বিছানার ধারে মোড়া পেতে বসে আছে দেখে বাবলু এত অবাক হয়ে গেছে।

'কোথায় ছিলি সারাটা বিকেল?'

বাবলু মাকে মিথ্যা কথা বলল, 'বিজুরা বল খেলছিল দেখছিলাম।'

'বেশ করেছ, খেলা দেখবে, নিজেও খেলবে, তবে তো শরীর ভাল হবে।' বাবা বলল, 'যাও, বই রেখে জামাকাপড় ছেড়ে বাথরুমে গিয়ে বেশ ক'রে হাত মুখ ধুয়ে এসো, এসে আঙুর খাও।'

বাবা যখন আদর করে তখন তার কথাগুলো এমন নরম, ঠাণ্ডা ও মিষ্টি লাগে যে, বাবলুর ইচ্ছা করে বাবার কোলে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কোল থেকে আর নামে না। কিন্তু বাবাকে সে ক'দিন পাচ্ছে, কতক্ষণ পায়!

'আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে।' মা আবার ধমক দিচ্ছে। মা আজ তাকে এত বেশি বেশি ধমকাচ্ছে কেন এটাও বাবলু চট্ ক'রে বুঝে ফেলল। বাবা আজ সকাল সকাল বাড়ি ফিরেছে, বাবা মার বিছানার পাশে বসে আছে, বাবা এত বড় আঙুরের ছড়াটা এনে মার বালিশের কিনারে রেখেছে আর তাই থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মা টুপটাপ মুখে ফেলছে। বেশি খুশি হয়েই মা এখন এত কথা বলছে, বাবলুকে শাসন করছে নাকি। বাবলুর মুখ টিপে হাসতে ইচ্ছা হ'ল কিন্তু হাসল না। বই রেখে জামা ছেড়ে আস্তে আস্তে ও বাথরুমের দিকে চলল। ঈশ্বর! ঈশ্বর তার কথা শুনেছে তাতেই বাবলু সন্তুষ্ট! তার যে কি ভাল লাগছিল। সাবান দিয়ে রগড়ে রগড়ে সে হাত মুখ পা ধুতে লাগল। আর তখন, যেন খুশির একটা বুদ্বুদ তার বুকের মধ্য থেকে মগজে উঠে এল। একটা দু'টো। এক সঙ্গে অনেকগুলো বুদ্বুদ, অনেকগুলো কথা: 'বাবা, আজ তো তুমি সকালে বাড়ি ফিরেছ, অনেকদিন তো তোমাকে পাই না। আজ আমায় একটু বেড়াতে নিয়ে চলো না। তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাই না, কোনোদিন যাই না। আমার এমন ইচ্ছা করে। বিজুর বাবা বিজুকে নিয়ে রোজ মর্নিং ওয়াক্ করে। সোমেন সেদিন তার বাবার সঙ্গে নিউ মার্কেট আর ইডেন গার্ডেন ঘুরে এল। শঙ্কর তার বাবার সঙ্গে আর এক রবিবার আলিপুর গিয়েছিল চিড়িয়াখানা দেখতে। সবাই যাচ্ছে কেবল

আমিই—' বলবে সে বাবাকে গিয়ে এখন, বলবে কি? 'রাত্রি হয়ে যাচ্ছে, বেশিদূর যাব না। মোড়ের পার্ক পর্যন্ত। তাতেই আমি খুশি। কেবল তোমার হাত ধরে আমি—' কিন্তু বাবলু কি সাহস পাবে বলতে। বাবাকে হয়তো মা আজ আর বেরোতেই দেবে না, বাবা হয়তো বেতের মোড়া ছেড়ে এখন উঠবেই না। ঈশ্বর, ঈশ্বর! এমনও তো হতে পাবে, এখন ওঘরে গেলেই মা বলবে, পড়তে বসো। অতিরিক্ত সুখী হয়ে মা তাকে অতিরিক্ত শাসন করছে নাকি। বাবলু ভাবল। হয়তো মা বলবে, 'পড়ার টেবিলে গিয়ে বসে আঙুর খাও .তারপর রাত দশটা পর্যন্ত পড়ো।' যদি বলে? বাবলুর কেমন ভয় ভয় করছিল। মাকে তার এখন একটু ঈর্ষা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল। অবশ্য করল না সে। মার জন্য সত্যিই সে দুঃখী। মা কষ্ট পাচ্ছে। তা ছাড়া, বেচারার অসুখ একেবারেই ছাড়ছে না। 'ঈশ্বর, ঈশ্বর! মাকে সকাল সকাল ভাল ক'রে দাও। বাবার এখন সুমতি হয়েছে, তুমি এখন চট্ ক'রে মার অসুখটা সারিয়ে দিলেই বস্ হয়ে যায়।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাবলু এক পা এক পা ক'রে দু'জনের সামনে এসে দাঁড়াল। 'দাও, ওকে আঙুর দাও।' বাবার ঠাণ্ডা মিষ্টি গলা।

যেন মার সুমতি হ'ল। তখনি বাবলুকে পড়তে যেতে না বলে এক মুঠ আঙুর ছিঁড়ে বাবলুর হাতে গুঁজে দিল। কেবল বলল, 'ঘর নোংরা করো না, ওখান থেকে একটু কাগজ ছিঁড়ে এনে বীচিগুলো ওতে ফেল, তারপর তুলে বাইরে ফেলে দিলেই হবে।'

যেন ঘুড়ির মত উড়ে গিয়ে বাবলু তার পড়ার টেবিল থেকে এক টুক্‌রো কাগজ নিয়ে এসে বাবার পায়ের কাছে মেঝের ওপর আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে আঙুর খেতে লেগে গেল। বাবা একটা হাই তুলে সোজা হয়ে বসে। মা তখনো একটা দুটো ক'রে আঙুর চুষছে। ঠিক তখন। আবার এক ঝাঁক খুশির বুদ্বুদ বাবলুর বুকের ভিতর

থেকে মগজের মধ্যে উঠে গিজ গিজ করতে লাগল। মগজে না উঠে যদি মুখে এসে ঠাঁই নিত তো 'বাবলুর পক্ষে সেগুলো বের. ক'রে দেওয়া সহজ হ'ত। কিন্তু তা তো হ'ল না। বাবাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথাটাই সে জিহ্বায় আনতে পারল না। মাথার মধ্যে থেকে সেটা ঘুরপাক খেতে লাগল।

বাবা উঠে দাঁড়ায়। বাবলু চোখ বড় ক'রে তাকায়।

মা ক্ষীণ হাসে। মার রোগা মুখের হাসি কত সুন্দর বাবলু যেন জীবনে এই প্রথম দেখল। দেখে আঙুর খাওয়া ভুলে গিয়ে মার মুখের দিকে তাকাল। 'আজ না হয় না বেরোলে।' মা বলছিল। অল্প হেসে বাবা মাথা নাড়ল। আর একটা হাই তুলল। দু' হাত ছড়িয়ে দিয়ে এক জায়গায় এতক্ষণ বসে থাকার জড়তা ভাঙ্গল। বাবার হাতের রগে টান পড়ে পট্ পট্ শব্দ হয়। 'না তোমার ইঞ্জেকশন ফুরিয়েছে, আজ এনে না রাখলে কাল সকালে তো দেওয়া যাবে না।'

মা চুপ ক'রে তাকিয়ে এখন আর দেয়াল না, বাবার মুখ দেখে, চোখ দেখে। আজ সেই মুখ কত নরম, চোখ কত শান্ত। 'কতক্ষণ আর লাগবে। ইঞ্জেকশনটা এনে রাখাই ভাল।' মার কপালে হাত রাখে বাবা। শুকনো বাঁকা একটা চুল সরিয়ে দেয়। অমলের বাবার কথা মনে পড়ে যায় বাবলুর, অমলের মার মুখ চোখের সামনে ভাসে। বুকের ভিতর হঠাৎ কেমন শির্ শির্ করে উঠল তার। তাড়াতাড়ি ভয়ে চোখ বুঁজে মুখ নিচু ক'রে মনোযোগ দিয়ে সে বীচিসুদ্ধ আঙুর চিবোতে থাকে। 'না, বলছিলাম শরীরটা ভাল নেই বলছিলে। সকালে যখন ঘরে এলে, থাক না আজ ইঞ্জেকশন আনা, না হয় একটু সকাল সকাল খেয়েই শুয়ে পড়লে, শরীরটা রেস্ট পাবে।'

মার কথার উত্তরে বাবা কিছু বলল না, এক পা দু' পা ক'রে আলনার দিকে সরে গেল। 'আমার তো অসুখ বারোমাস।

একবেলা ইঞ্জেকশন না পড়লে মরে যাব না। শুধু ইঞ্জেকশন আনতে এখন বাইরে না ছুটলেও হয়'—একটু থামল মা, তারপর শেষ করল : 'আমি তো তাই বুঝি।'

করুণ, কিন্তু কত আপন জন হলে মানুষ এমন জোর দিয়ে কথা বলে বাবলু তার ছোট্ট মাথায় তা বেশ বুঝতে পারল। ফ্যালফ্যাল করে সে একটুক্ষণ মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু বাবার যে বাইরে যাওয়ার মতের কোনো পরিবর্তন হ'ল না তা তাঁর শার্ট প্যান্ট টাই জুতো হাতে ক'রে পাশের ঘরে, মানে বাবলুর পড়ার ঘরে সরে পড়া থেকে বোঝা গেল। মা একটা হাল্কা নিঃশ্বাস ফেলল। অন্যদিনের মত বিষণ্ণ গাঢ় নিঃশ্বাস না। হাসছে। 'তোর আঙুর খাওয়া হ'ল?' আঙুরের স্বাদ ভুলে গিয়ে বাবলু অন্য কথা ভাবছিল। মার অসুখ বলে দেরি ক'রে বাবার বাড়ি ফেরা না, মার ওষুধ আনতে শুধু একটা ইঞ্জেকশন আনতে শরীর-খারাপ নিয়ে এখন আবার বাইরে ছুটছে। আনন্দে বাবলুর বুকের ভিতরটা বেলুনের মত ফুলে ওঠে। 'আমি বাবার সঙ্গে যাই মা?' বাবলুর প্রস্তাব শুনে মা হঠাৎ চুপ ক'রে রইল। তারপর ক্ষীণ হাসল : 'ও তো আমার ওষুধ আনতে যাচ্ছে এখনি ফিরে আসবে।'

'সেজন্যেই তো বলছি আমারও একটু বেড়ানো হবে।'

'বলে দ্যাখ্। কাল ক্লাসের পড়া আছে না?'

পড়ার চিন্তা বাবলু অনেকক্ষণ আগেই মন থেকে খেদিয়ে বিদায় করেছে। ঠোঁট উল্টে বলল, 'শনিবার। বাঙলা আর জিওগ্রাফি আর ড্রয়িং। বাঙলা পুরোনো পড়া। জিওগ্রাফি আগেই আমি বেশি করে শিখে রেখেছিলাম—' বাবলুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ঘরে এল। পোশাক পরা হয়ে গেছে। 'তাহলে আমি চলি?'

বাবার দিকে তাকিয়ে তারপর বাবলুকে দেখতে দেখতে মা আবার ক্ষীণ হাসে। বাবলু সাগ্রহে অপেক্ষা করছে একটা কথার।

'বাবলু তোমার সঙ্গে যেতে চাইছে।'

যেন একটু চমকে উঠল বাবা। বাবলুর দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বাবা মার চোখে চোখ রেখে বেশ আপত্তির সুরে বলল, 'আমি তো ওষুধ আনতে যাচ্ছি। যাব সেই বিডন স্ট্রীট। রিলায়েবল ডিস্পেনসারী ছাড়া ধারে-কাছের বাজে দোকানগুলো থেকে ওষুধ-ইঞ্জেকশন আনা ঠিক না। তা ছাড়া রাত হয়ে গেছে, এখন অমার সঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে।' বাবা থামতে মা বাবলুর দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসে। মা আবার একটা আঙুর গুঁজেছে মুখে। আ, যদি মা এমন করে তখন তার দিকে তাকিয়ে না হাসত যদি গম্ভীর হয়ে যেত! কিন্তু আজকের পরিবেশ তো তা না, সম্পূর্ণ অন্যরকম। মার কাজে বাবা গরজ করে বেরোচ্ছে। মার আঙ্গুর গোঁজা মুখে নীরব আহ্লাদের হাসি। এই আনন্দের ভাগ বাবলুকেও যে নিতে হবে। যেন জিদ চেপে গেল তার। এক সেকেণ্ড আর না ভেবে উঠে দাঁড়িয়ে বাবার হাত জড়িয়ে বায়না ধরল: 'বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'রাত হয়ে গেছে। তা ছাড়া বিডন স্ট্রীট থেকে ফিরে আসতে একটু দেরিই হয়তো হবে।'

বাবা হাত ছাড়াল না, তাই বাবলুর সাহস বেড়ে গেল।

'তা হোক, এইটুকুন রাতে কিছু হবে না, তোমাব সঙ্গেই তো যাচ্ছি।'

বাবা জানালার দিকে ঘাড় ফেরাল। 'তা ছাড়া আকাশের অবস্থাও যে ভাল না।'

'তাতে কি, আমরা তো মোড় থেকে বাসে চাপছি বাবা।'

'আজ থাক না।' বাবা এবার বাবলুর হাত সরিয়ে দেয়।

আশ্চর্য, বাবলু কেঁদে ফেলল, আহ্লাদের কান্না আব্দারের কান্না। এভাবে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে সে আর কোনদিন কেঁদেছে যদি তখন এতটা অবুঝ না হত তো তার নিশ্চয় মনে পড়ত। কিন্তু তার

মনের অবস্থা বিকেল থেকে বদলে গেছে। আবেগের আতিশয্যে সে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল।

'ওকে সঙ্গে নিলে তোমার খুব বেশি অসুবিধে হবে কি?' মা বলল, 'আমি তো বারণ করছি শুনছে না।'

'আর যা ভিড়, আজকাল ট্রামবাসে একলা চলাই দায়। তারপর বাচ্চা-কাচ্চা সঙ্গে থাকলে তো—'বাবা দরজার দিকে সরে যায়। বাবলুর কান্নার বেগ আরো বাড়ে।

'পরশু রবিবার। ওঁর ছুটি আছে। সারাদিন তোকে নিয়ে বেড়াবে।' মা আধশোয়া হয়ে উঠে বসে বাবলুকে প্রবোধ দিতে দিতে দরজার দিকে তাকায়। 'তুমি পরশু দিন ওকে বেড়াতে নিয়ে যেও। অনেকক্ষণ ধরে দু'জনে বেড়াতে পারবে।'

কে জানে, যেন অনেকক্ষণ বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে বেড়ানোর প্রস্তাবে বাবার ভবনা হল। দরজায় দাঁড়িয়ে একটু সময় ভেবে নিয়ে পরে ঘুরে দাঁড়ায়। 'নাও, জুতো-জামা পরে নাও—থাক আর কাঁদতে হবে না। বলছি তো এসো।'

বাবলু ফিক্ করে হেসে ফেলল। ঈশ্বর ঈশ্বর। ডাকল সে। ঈশ্বর তার সব ইচ্ছা পূরণ করেছে। ভাবল সে। 'বাসে চুপ করে শান্ত হয়ে বসবে। রাস্তায় দুষ্টুমি করবে না। বাবার হাত ছেড়ে কোথাও যাবার চেষ্টা করো না।' মার কথা ও হাসি আরো উজ্জ্বল স্পষ্ট হয়েছে। জুতোর ফিতে বাঁধা শেষ করে বাবলু হাসি-হাসি মুখে মাথা নাড়ে।

বাবলু শুনেছে সেন্ট্রাল এভেন্যু, বিবেকানন্দ রোডের মতন বিডন স্ট্রীট। ট্রাম লাইন নেই, কিন্তু বাস চলে। কিন্তু এটা কি বিডন স্ট্রীট। বাবলু ঠিক বুঝতে পারছিল না। সরু গলি। স্ট্রীট বা রোড না, নিশ্চয়ই লেন হবে। আন্দাজ করল সে, আর মুখ তুলে এক-আধটা সাইনবোর্ড দেখা যায় কি না, লক্ষ্য করে করে বাবার সঙ্গে হাঁটতে লাগল। যদি রাস্তার নাম লেখা থাকে কোথাও।

যেখানে ওরা বাস থেকে নেমেছিল সেটা বেশ বড় রাস্তা। অনেক আলো-টালো ছিল। কিন্তু গলিটা কেমন অন্ধকার আর খুব ঘিঞ্জি। আর এত ধোঁয়া জমে আছে যে বাবলুর চোখ জ্বালা করছিল। বাবার চোখ জ্বালা করছে কি না, বাবলুর জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হলেও তা সে চেপে গেল। কেননা বাসে আসতে 'ঠিক হয়ে বসো', 'বাইরে মাথা নিও না,' রকমের দুটো একটা কথা বলা ছাড়া বাবা প্রায় সব সময়ই গম্ভীর ছিল। যেন কি ভাবছিল। এখনও ভাবছে। সম্ভবত মার অসুখের কথা, ইঞ্জেকশন কেনার কথা। হাঁটতে হাঁটতে দু'জন একটা পানের দোকানেব সামনে এসে দাঁড়াল। ছোট্ট হলেও দোকানটা বেশ সাজানো। পান যেমন তেমন সিগারেটের বাক্স আর সোডার বোতলে একেবারে ঠাসা। এই সরু গলিতে এত সিগারেট আর সোডা কে খায় বাবলু অবাক হয়ে ভাবছিল। কিন্তু সেই ভাবনা তাব বেশিক্ষণ থাকে না। এবাব সে দোকানের আলমারির গায়ে টাঙানো ছবিগুলো দেখছে। দেখছে আর তার চোখ দুটো ক্রমশ গোল হয়ে যাচ্ছে। যেন নিঃশ্বাস পড়ছে না তার। তারপর বাবা পাশে দাঁড়িয়ে আছে মনে পড়তে ভয়ে লজ্জায় সে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে বাবাব পায়েব জুতো দেখতে লাগল। তার এই দশ বছর বয়সে কলকাতাব রাস্তায় সে অনেক দোকানে অনেক রকম ছবি দেখেছে, ক্যালেণ্ডার দেখেছে। কিন্তু এই ছবিগুলো অন্যরকম। বাবলু রীতিমত ঘামছিল। 'আপকো লেড়কা?' পানওয়ালা শুধায়। বাবা তার উত্তরে মাথা নেড়েছে নিশ্চয়, চোখ না তুলেও বাবলু আন্দাজ করে। কিন্তু উলঙ্গ ছবি দেখার মতন তৎক্ষণাৎ আর একটা চমক বাবলুকে নাড়া দেয়। 'বাবুজী আজ বড় সকাল সকাল এলেন?' বাংলা কথা হলেও দোকানীর হিন্দুস্থানী টানটা কড়া হয়ে বাবলুর কানে লাগে। 'হ্যাঁ আকাশটা ভাল না।' বাবার গলা: 'আবার জলটল হয় কিনা কে জানে। একটু সকালে ফেরার মতলব।' খুচরো পয়সাগুলো

ও নতুন সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে ফেলে বাবা বাবলুর হাত ধরল : 'চলো।'

এই নোংরা রাস্তাটায় বাবা মাঝে মাঝে আসে। নিশ্চয় ধারে কাছে বাবার জানাশোনা সেই ওষুধের দোকান। সেইজন্মেই এখানে আসতে হয়। কিন্তু এই অসভ্য ছবি টাঙানো পানের দোকানটায় বাবা সিগারেট কেনে কেন, ভেবে বাবলুর দুঃখ হল। যদি সর্বদা সিগারেট না কিনবে তো বাবাকে দোকানী অত জানবে কেন। বাবলু একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলে হাঁটে। আরো দুটো একটা পানেব দোকান তার চোখে পড়ল। সেগুলোও সিগারেটের বাক্স আর সোডার বোতলে ঠাসা। তবে ওটাই সবচেয়ে বড় দোকান। বুঝতে পেরে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলার মতন হুস্ করে কথাটা বাবলুর মনে পড়ল। বড় দোকান বলেই বাবা ওখানে সিগারেট কেনে। বাবা নিশ্চয়ই সেই ফটোগুলোর দিকে তাকায় না। বাবা কোনদিনই তাকায়নি। যদি একদিন আলমারির ওপরের দিকে তাঁর চোখ যায় তো বাবা আব ওর দোকান থেকে সিগারেটই কিনবে না যত টাটকা সিগারেট লোকটা রাখুক না কেন। ভেবে বাবলু নিশ্চিন্ত হল। বরং তারই উচিত হয়নি অই একটু সময়ের মধ্যে হা করে তাকিয়ে থেকে সব ক'টা ছবি দেখে শেষ করা। খুব খারাপ কাজ করেছে বাবলু। তার অপরাধ হয়েছে। বাবা যদি সিগারেট কেনার দিকে মন না দিত, তো নিশ্চয়ই বাবলুর কাণ্ড দেখে তার কান মলে দিত। আড়চোখে বাবলু বাবার মুখ দেখছিল। বাবলু ঠিক মনে করতে পারছিল না, বাবা কোনদিন তার কান মলেছে কিনা। মা মেরেছে, অসুখে ভুগে ভুগেও বাবলুকে মেরেছে, কিন্তু বাবা?

ডিস্পেন্সারীর চেহারা দেখে বাবলুর বুক দমে যায়। এই কি বড় দোকান, ভাল ওষুধের দোকান? তার মনে প্রশ্ন জাগল। দুটো মোটে আলমারি। একটার প্রায় সবগুলো কাঁচই ভাঙা। মাথার ওপর বিশ্রী শব্দ করে একটা পাখা ঘুরছে। আলোর

ডোমটা লাল হয়ে গেছে। টেবিলটায় মনে হয় অনেক ধুলো জমে আছে। কেননা, বাবলু একটা আঙুল রাখতে তার ছাপ পড়ল। ভয়ে ভয়ে সে লোকটার চেহারা দেখতে লাগল। এই কি ডাক্তার? বাবার কথা শুনে বাবলুর তাই মনে হল। কুচকুচে কালো রং। মাথাটা প্রকাণ্ড। তার ওপর একটাও চুল না থাকাতে পাকা তালের মত চকচক করছে। ভীষণ নোংরা দাঁত। সারাদিন পান চিবোয়। বাবলু ভাবল। ওপরের পাটির একদিকে দুটো দাঁত নেই। কেন জানি লোকটাকে দেখেই বাবলুর কেমন মন খারাপ লাগছিল। ও কি ভালো ওষুধ রাখবে, ওর ইঞ্জেকশনে কি মা ভাল হবে, এমন একটা আশঙ্কাও বাবলুর মনে উঁকি দিচ্ছিল। সবচেয়ে তার খারাপ লাগছিল কালো পুরু দুটো ঠোঁট নাচিয়ে লোকটার থেকে থেকে হেসে ওঠা। সব কথায়ই ও হাঁসছে। যেন খুব ফুর্তিতে আছে। আর কী বিশ্রী চোখের রং। লাল গোল চোখ দুটো দেখে বাবলুর কেবলই দুটো পেঁয়াজের কথা মনে পড়ছিল। অনর্গল বিড়ি টানছে। এটাও বাবলুর কাছে বড় অদ্ভুত লাগল। বিড়ি ছোটলোকেরা খায়। রিক্সাওয়ালা, মুটে, দারোয়ন, চাকর, দপ্তরীদের সে বিড়ি খেতে দেখে। তার বাবা, অমলের বাবা, তাদের ইংরেজির মাস্টার, সেদিন পাড়ায় ইলেকট্রিকের একটা মিটার দেখতে কর্পোরেশনের এক ভদ্রলোক এসেছিল, সব, সকলকেই বাবলু সিগারেট খেতে দেখে। টাই স্যুট-পরা কোনো লোক বিড়ি টানতে পারে কি না, চিন্তা করে বাবলু কেমন বিব্রতবোধ করছিল। 'তা তুমি বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে কেন?' প্রশ্ন করে লোকটা আবার শব্দ করে হাসে। 'হঠাৎ তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি, হা-হা।' বাবলুকে আড়চোখে দেখে বাবা চুপ করে থাকে। প্রশ্নটা ইতিমধ্যে আরও দু'বার করা হয়েছে। যেন বাবা তার উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না। বাবলুর ভীষণ রাগ হচ্ছিল লোকটার

ওপর। বাবা তাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে, তা কি হয়েছে। আর এ-কথায় এত হাসির কি আছে। লোকটার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না তার। 'নাকি তুমি যে একটা ফ্যামিলী ম্যান, এ-পাড়ায় এসে তার পরিচয় দিতে চাইছ, হা-হা।' বাবলুর ইচ্ছা করছিল আঙুল দিয়ে সে তার কানের ছিদ্র দুটো বন্ধ করে রাখে। হাসিটা তাহলে আর শুনবে না। 'না না।' বাবার গলা। বাবলু কান খাড়া করে রাখল বাবার উত্তর শুনতে। 'ভীষণ কান্নাকাটি করছিল। কোনদিন তো ও আমার সঙ্গে বেরোতে চায় না, আজ যে ওর কি—' বাবা আবার আড়চোখে বাবলুকে দেখে। 'আজ ভূতে পেয়েছিল, কেমন রে খোকা, হা-হা।' বাবলুর ইচ্ছা করছিল, একটা ঘুষি মেরে লোকটার নাক থ্যাতলা করে দেয়, হাসি থামিয়ে দেয়। কিন্তু চুপ করে, মুখ গুঁজে বসে থাকা ছাড়া কি আর সে করতে পারল। 'তা কি করবে এখন', পেঁয়াজ রঙের চোখ দুটো বাবার দিকে ঘুরিয়ে লোকটা আবার মুখে বিড়ি গুঁজল। মার প্রেসক্রিপশনটা বাঁ-হাতে তুলে আর একবার নাড়াচাড়া করে মাথা নাড়ল।

'এসব ওষুধ আমরা রাখি না, তুমি তো জানো ব্রাদার—এই ইঞ্জেকশনের জন্য তোমাকে লাহিড়ী কোম্পানি কি ডি ইমার্সনে যেতে হবে।' বাবা কথা বলল না। যেন হঠাৎ তাঁর ক্লান্তি পেয়েছে। একটা পা চেয়ারে তুলে দিয়ে মাথাটা পিছনে এলিয়ে দেয়। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বার করে। এখানে মার ইঞ্জেকশন পাওয়া যাবে না শুনে বাবলু ভেবেছিল তৎক্ষণাৎ বাবা উঠে দাঁড়াবে এবং তাকে নিয়ে বেরিয়ে অন্য দোকানে যাবে। কিন্তু বাবার চেহারা দেখে তা মনে হল না। সিগারেট ধরানো শেষ করে বাবা লোকটার চোখে চোখ রেখে হাসল: 'তা সে আমি আগেই ধরে নিয়েছি। পেনিসিলিন আর সালফা ড্রাগস ছাড়া তোমার তো আর কিছু রাখবারও কথা নয়, হা-হা।' 'হা-হা।'

বাবার চেয়ে চারগুণ জোরে লোকটা হাসে ঃ 'যে-পাড়ায় এসে ঠাঁই নিয়েছি অই ছাড়া চলবে কেন, হা-হা।' খুব অস্বস্তিবোধ করছিল বাবলু। মার ওষুধ না পেয়ে কোথায় বাবা একটু চিন্তা করবে, ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়বে, তা না নিশ্চিন্তমনে সিগারেট টেনে চলল। একবার হাতের ঘড়ি দেখল। তারপর ইংরেজিতে দুজনে কি সব কথাবার্তা বলতে লাগল। বাবলু কান খাড়া রাখল। কিন্তু একটা কথারও মানে সে বোঝে না। তার 'লোটাস রীডারে' এত সব ইংরেজি শব্দ নেই। 'ইয়াং' কথাটার অর্থ চিন্তা করতে করতেই সে ঘেমে সারা হচ্ছিল। তারপর তো কত কথা হল। বাবা প্রশ্ন করছে। লোকটা ঘন ঘন মাথা নাড়ছে। লোকটা যে শুধু বাবার পরিচিত তা নয়, যেন অনেক দিনের বন্ধু। বন্ধু না হলে আর 'তুমি, তুমি' বলবে কেন। এরকম একটা লোকের সঙ্গে বাবার বন্ধুত্ব থাকতে পারে, কোনদিন সে ভাবেনি। বাবা সেই দোকান থেকে সিগারেট কিনেছে বলে বাবলু তখন যত না বেশি অসহায়বোধ করছিল, এখন এই কালো কুচকুচে রং, নোংরা দাঁত, পেঁয়াজ রঙের চোখ ও টেকো মাথাওয়ালা লোকটাব সঙ্গে বাবার এত বেশি মাখামাখি দেখে সে অনেক বেশি অসহাযবোধ কবছিল। হঠাৎ খচ্ করে একটা কথা মনে হল তার। তাদেব ক্লাশের বিজয়ের জন্য তার বাবা একজন প্রাইভেট টিউটর বেখে দিয়েছেন। ছেলে পড়ানো ছাড়া সেই মাস্টার হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করে। বিজয় বলছিল। চিন্তা কবে বাবলুর এখন ভয়-ভয় করতে লাগল। কোনদিন না বাবা এই লোকটাকে বাড়িতে পড়াবার জন্য বাবলুর মাস্টাব ঠিক করে দেয়। না, না। বাবলু এখনই মনে মনে ঠিক কবে ফেলল, এই লোকের কাছে সে কোনদিনই পড়বে না। অসুখের ছুতো কবে বিছানায় শুয়ে থাকবে। কিন্তু লোকটা যে এদিকে আবার ডাক্তার। 'কি অসুখ হয়েছে পেট ব্যথা, মাথার কনকনানি? এসো, আমার কাছে এসে

বসো। এক্ষুণি একটা ডোজ দিচ্ছি, খেয়ে ফেল, সব ব্যথা কনকনানি সেরে যাবে, তারপর পড়তে বসো।' বাবলু কল্পনা করে। এমনও তো হতে পারে। হয়তো রোজ পকেটে ওষুধের পুরিয়া নিয়ে লোকটা তাকে বাড়িতে পড়াতে যাবে। কথাটা মনে পড়তে বাবলু ভীষণ ভাবনায় পড়ল। তাহলে কি করা যায়? করা যায়, করা যায়—এই লোককেই যদি তার বাড়ির জন্য মাস্টার ঠিক করা হয় তো বাবলু কাউকে না জানিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। সেই ভাল হবে। বাড়ি থেকে সে পালিয়ে যাবে। উত্তেজনায় আক্রোশে তার বুকের মধ্যে ঢুবঢুব করতে লাগল। কিন্তু একবার ছু'বার। তারপর ঢুবঢুবানি একেবারে থেমে যায়। বুক ভার হয়ে ওঠে। যেন শ্বাস ফেলতে বাবলুর কষ্ট হয়। না-না পালানো তার কেমন করে হবে। মা, মাকে এমন অসুখে ফেলে সে কোথায় যাবে। মার মুখ মনে পড়ে তার কান্না পেতে লাগল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সে কান্না রুখতে মুখটা আরো নামিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে। তবে, তবে কি কবা যায়! যদি —বাবলু ঈশ্বরকে ডাকল। ঈশ্বর, ঈশ্বর। এই লোকটাকে মাস্টার ঠিক করার কথা যেন বাবার একবারও মনে না হয়, কোনদিন মনে না হয়। ঈশ্বর।

বুকটা একটু হাল্কা হতে বাবলু মুখ তুলল। বাবার চেহারা দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়। না, সেসব কথা বাবা ভাবছেই না। আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা জ্বলছে। ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। 'কত নম্বর বললে?' বাবা প্রশ্ন করছে: 'ভি ডি?' ডাক্তার জোরে মাথা নাড়ে। 'নো নো ব্রাদার, আমি জানি। বেষ্ট্ অব দি লট। তুমি একবার ট্রাই করতে পার।' এখন আর হাসছে না, নোংরা দাঁতগুলো মেলে ধরে লোকটা বাবাকে দেখছে। যেন বাবা আবার কি চিন্তা করল। আড়চোখে বাবলুকে দেখল। চোখে চোখ পড়তে বাবলু মুখ নামায়। বাবা যেন সত্যিই এখন অনেক দূরে সরে গেছে। অথচ সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে মার বিছানার পাশে বেতের

মোড়ায় যতক্ষণ বসা ছিল বাবাকে সে কত কাছে পেয়েছিল। কত নরম মিষ্টি লাগছিল তার চাউনি, তাঁর প্রত্যেকটি কথা। 'সাত-এর সি।' লোকটা বলছে, 'ববং আজই একবার ট্রাই কর না, একবার দেখে যাও অন্তত। টল্ ফেয়ার কমপ্লেকশন।' প্রথম শব্দটার অর্থ বাবলু বুঝল কিন্তু বাকিটুকু বুঝতে না পেরে বোকার মত সে ড্যাবডেবে চোখে মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল। 'ছাটস্ রাইট, তুমি যখন রেকমেণ্ড করছ, একবার গিয়ে দেখতেই হচ্ছে।' বাবা নড়েচড়ে বসে এবং সিগারেটটা জোরে জোরে টানে। চোরের মত চোখ তুলে বাবলু বাবার দিকে না তাকিয়ে পারে না। তাঁর কপালের পাশের রগটা ফুলে উঠে কাঁপছে। কি দেখতে চাইছে বাবা, কাকে দেখতে বলছে। সাত-এর সি বাড়ি কোথায় চিন্তা করে বাবলু কুলকিনারা পাচ্ছিল না। 'একটু ভিতরের দিকে এগিয়ে প্রথম যে লাইটপোস্টটা পাচ্ছ তার গাঁয়েই বাড়িটা। দোতলা।' ডাক্তার হাত তুলে যেন এই —এই রাস্তারই ভিতরের দিকটা বাবাকে বোঝায়। বাবা মাথা নাড়ে। 'আমি জানি, আমার তো অপরিচিত না এ-পাড়া, এখন বুঝেছি। কিন্তু'—বাবা থামতে না থামতে লোকটা বাবলুকে একনজর দেখে ঘাড় নাড়ল। 'ছাটস্ রাইট, খোকা এখানে অপেক্ষা করুক। আমি তো আছি, বড় জোর আধঘণ্টা লাগবে তোমার ঘুবে আসতে, কেমন হল?' বাবা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়। বাবলুব মাথায় হাত রাখেঃ 'আমি এক্ষুনি ফিরে আসছি, দেখি পাশের দোকানে তোমার মার ইঞ্জেকশনটা পাওয়া যায় কিনা। তুমি বস, এসেই আমরা বাড়ি চলে যাব, কেমন?' ঘাড় কাত করল বাবলু। না করে করবে কি, কিন্তু কেমন খট্‌কা লাগছিল তার মনে। সত্যি কি বাবা মার ওষুধ আনতে বেরিয়ে গেল। ভিতরের দিকে কি ভাল ডিস্পেন্সারী আছে। তো বাবলুকে সঙ্গে নিতে দোষ ছিল কি? জ্বরের সময় যেমন মুখটা খারাপ লাগে, গলার কাছে তেতো তেতো ঠেকে বাবলুর এখন তাই মনে হচ্ছিল। ফ্যালফ্যাল করে বাবার চলে

যাওয়া দেখতে দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া সে আর কিছুই করতে পারল না। একটা কথা তার মুখ দিয়ে বেরোল না।

একটু সময় কাটল। আধ ঘণ্টার আর ক' মিনিট আছে, বাবলু আন্দাজ করতে পারছিল না। ঘড়ি থাকলে অবশ্য সে দেখে বুঝত। মিনিট সেকেণ্ড-এর দাগগুলো পর্যন্ত সে এখন চিনে ফেলেছে। বাড়ির টাইমপিস দেখে সে এখন ঠিক ঠিক সময় মাকে ওষুধ দিতে পারে। এখানে টাইমপিস বা ওয়াল-ক্লক বলে কিছু বাবলুর চোখে পড়ল না। লোকটার হাতে ঘড়ি আছে বটে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে বাবলুর সাহস বা ইচ্ছা কোনটাই হচ্ছিল না। এবং বাবা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা যে মাথা গুঁজে নিজের কাগজপত্র দেখছে, বাবলুর সঙ্গে আর একটাও কথা বলছে না, বাবলুর ভাল লাগছিল। তাই মাথা তুলে স্বাধীনভাবে সে ঘাড় মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর একবার ঘরের দেয়াল, কাঁচভাঙা আলমারি, নড়বড়ে পাখা, লাল হয়ে আসা বাল্ব এবং কালো কুচকুচে টাকপড়া প্রকাণ্ড মাথাটা দেখতে পারছিল। এমন সময় কে একজন ভিতরে ঢুকল। চটি পায়ে। কাপড়টা ময়লা, শার্টটা তার চেয়েও বেশি ময়লা। কাঁধের একপাশ ছিঁড়ে গেছে। লাল সুতো দিয়ে খানিকটা যেন সেলাই করা হয়েছিল, কিন্তু টেঁকেনি, আবার ছিঁড়েছে বাবলু লক্ষ্য করল। আর কী ভীষণ রোগা লোকটা। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। রোগা এবং ছেঁড়া ময়লা কাপড়-জামা-পরা মানুষ রাস্তায় ঘাটে ট্রামে বাসে সে কত দেখে, কিন্তু এই লোকটার নাকের পাশে কপালে ঘায়ের মত লাল লাল দাগগুলো দেখে বাবলুর কেমন খারাপ লাগছিল। ঘেন্না পাচ্ছিল। ব্রন পাঁচড়া? এগুলো কি বাবলু বুঝতে পারছিল না। বাবলুর পিঠটা কেমন শিরশির করছিল। পায়ে বা হাতে হলে তবু একটা কথা, মানুষের মুখে এরকম ঘা! বাবলু চিন্তা করে।

'আসুন, আসুন, কম্পাউণ্ডারবাবু!' কাগজপত্র থেকে ডাক্তার চোখ তুলল, 'এত দেরি করে ফেললেন।'

'একটু দেরি হয়ে গেল।' বলে লোকটা টেবিলের সামনে না দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে আলমারির ওধারে পর্দাটার কাছে সরে গেল।

'আটটা দশ।' ডাক্তার হাতঘড়ি দেখতে দেখতে চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'জানেন তো আটটার পর এক মিনিট আর আমি বসে থাকতে পারি না, মাথা ঝিমঝিম করে, কতক্ষণে গিয়ে জায়গায় পৌঁছব।'

ডাক্তারের সঙ্গে কম্পাউণ্ডারও হাসল।

'তা তো জানি স্যার, কিন্তু ঐ গিরীন শালার কাছে গিয়ে না দেরি হয়ে গেল।' ডাক্তার যদি নোংরা দাঁত বের করে হাসে কম্পাউণ্ডারটা ঠোঁট টিপে টিপে হাসে। আর তখন তার চোখ দুটো এমন পিট পিট করে। এ-ভাবে ঠোঁট টিপে চোখ টিপে হাসতেও বাবলু আর কাউকে কোনদিন দেখেছে কিনা, চিন্তা করল। ডাক্তারের হাসি দেখে যেমন তার রাগ হচ্ছিল, এই লোকটার হাসি দেখেও বাবলুর মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আর বেশিদিন হাসতে হবে না। মনে-মনে বলল সে। ওই তো টিঙটিঙে রোগা শরীব। 'আর বেশিদিন বাঁচতে হবে না তোমার, যক্ষ্মা হবে।' যেন ডেকে লোকটাকে বলতে ইচ্ছা করছিল বাবলুর। তাদের স্কুলে সেদিন সাধারণ স্বাস্থ্য নিয়ে একটা লোক ম্যাজিক লণ্ঠন দেখিয়ে বক্তৃতা করে গেল। এরকম রোগা একটা মানুষের ছবি দেখিয়ে বলেছিল এই শরীরে সহজেই যক্ষ্মার বীজ এসে বাসা বাঁধে। বাবলুর এখন ছবিটা মনে পড়ল। 'আর যদি যক্ষ্মা না-ও হয়, তোমার নাকের কপালের ঘাগুলো সারা মুখে ছড়িয়ে পড়বে।' বাবলু বলল। 'তখন আর এরকম কায়দা করে হাসতে হবে না।' বস্তুত এখানে দুটো মানুষের মধ্যে একটা মানুষকেও বাবলুব ভাল লাগছিল না। ডাক্তারটা খারাপ লোক, কম্পাউণ্ডারটাও খারাপ লোক। তার মন

বলছিল। ভাল লোকেরা এভাবে হাসে না। একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের হাসি তার মনে পড়ে। তাদের হেডমাস্টার বঙ্কিমবাবু ইংরেজির মাস্টার সুহাসবাবু, পাড়ার সনাতনবাবু, সনাতনবাবুর মোটর ড্রাইভার জগদীশ, বাবলুদের ধোপা রামধনিয়া, এমন কি, তাদের বাড়ির ঝি শোভার মার হাসি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। 'ওরা কেউ এভাবে হাসে না। ওদের হাসি দেখলে কি কোনদিন আমার রাগ পেয়েছে?' নিজেকে প্রশ্ন করল সে। চোখের ইঙ্গিতে বাবলুকে দেখিয়ে কম্পাউণ্ডারের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাক্তারটা যেন ফিসফিসিয়ে কি বলল। শুনে কম্পাউণ্ডারটা বাবলুকে একবার দেখে আবার ঠোঁট টিপে, চোখ টিপে ঘন ঘন মাথা নাড়ে। মানে তাকে নিয়ে কথা হচ্ছে। বুঝতে পেরে বাবলুর ইচ্ছা করছিল সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বাবা, বাবা তো এসে তাকে পাবে না। চিন্তা করে সে তেমনি চেয়ারটায় চুপ করে বসে রইল। একটা ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে ডাক্তার বেরিয়ে গেল। বাবলুর কিছুটা ভাল লাগল। কিন্তু তার ভয় হচ্ছিল একমুখ ঘা নিয়ে না কম্পাউ-ণ্ডারটা তার সামনের চেয়ারটায় বসে। তার সে-ভয় কাটে। লোকটা বসে না। ডাক্তার বেরিয়ে যেতে সে দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। বিড়ি টানে। হাত তুলে কাকে ডাকছে যেন। ঘাড় ফিরিয়ে বাবলু সেদিকে তাকিয়ে থাকে। সরু রাস্তাটার ওপারে একটা ছোট্ট দোকান। আলোর নিচে বসে চশমা চোখে বুড়ো মতন একটা লোক টুকটাক্ শব্দ করে কি যেন তৈরি করেছে। বাবলু আন্দাজ করল গহনার দোকান। হয়তো চুড়ি কি হার তৈরি হচ্ছে। বুড়োর সামনে মেঝের ওপর হাঁটু গেড়ে একটা মেয়েছেলে বসে আছে, আঙুল নেড়ে নেড়ে বুড়োকে কি যেন বোঝাচ্ছে। কম্পাউণ্ডারটা কি হাতের ইশারায় ওকেই ডাকল। একটু সময় কাটে। মেয়ে-ছেলেটা কম্পাউণ্ডারকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর রাস্তা পার হয়ে ডিস্পেন্সারীর দরজায় এসে

দাঁড়ায়। দুজন হাত নেড়ে ফিসফিসিয়ে কি বলাবলি করে। মেয়েটা এবার খিল খিল করে হাসল। তার গায়ে অনেক গহনা রয়েছে। সম্ভবত আরো একটা কিছু তৈরি করাচ্ছে। বাবলু ভাবে। কিন্তু এত জোরে আর এমন শরীর নাড়িয়ে মেয়েটাকে হাসতে দেখে বাবলু অবাক হয়। এভাবে কোন মেয়েকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সে হাসতে দেখেছে কি? তার মা তো এখন বাড়ি থেকে বেরোয় না, তাছাড়া অত জোরে মা কোনদিনই হাসে না। আর কে? অমলের মা থেকে আরম্ভ করে পাড়ার সনাতনবাবুর বাড়ির মেয়েদের সে মনে করতে চেষ্টা করল। যেন কারোর সঙ্গে এর মিল নেই। হাসি, কথা, এমন কি, এর কাপড় পরাটাও যেন অন্যরকম। চেহারাটা খারাপ না। কিন্তু দাঁতগুলো কেমন কালচে। খুব দোক্তা পান খায় হয়তো, বাবলু চিন্তা করল। কথা সেরে আবাব মেয়েটা গহনার দোকানে গিয়ে ঢোকে। কম্পাউণ্ডাব আব ভিতরে আসে না। ডিস্পেন্সারীর রকটার ওপর বসে থাকে। যেন আবার একটা বিড়ি ধরায়। লোকটা শিস দিচ্ছে না? বাবলু কান খাড়া কবে রাখল। শিস দিয়ে মেয়েটাকেই ডাকছে নাকি। কিন্তু মেয়েটা আর একবারও ঘাড় তোলে না। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে গহনা গড়া দেখছে। বাবলুর হঠাৎ খেয়াল হল আধ ঘণ্টার বেশি সময় কেটে গেছে কিন্তু বাবা তো এলো না। একলা ডিস্পেন্সারীর মধ্যে বসে তার এখন কেমন ভয়-ভয় করে। কম্পাউণ্ডারটা রক থেকে নেমে গেল নাকি। তবে ওষুধের দোকান পাহারা দেবে কে? আশ্চর্য, লোকটা তাকে বসিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল। যদি তার বাবা আরো আধ ঘণ্টা পরে আসে? ভয়ে ভাবনায় বাবলুর যেন শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। অনেকক্ষণ আগেই সে ওটা ছেড়ে উঠত। ভীষণ ছারপোকা। বাবা আসবে, বাবা এক্ষুণি আসবে ভেবে সে আর উঠতে পারছিল না। বাবলু দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দেয়। না লোকটা চলে যায়নি, একটা চায়ের দোকানের

সামনে দাঁড়িয়ে গ্লাসে ক'রে চা খাচ্ছে, আর কার সঙ্গে যেন গল্প করছে। রকটা ফাঁকা দেখে বাবলুর সাহস বাড়ে। চৌকাঠ ডিঙিয়ে সে সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। হাওয়াটা মিষ্টি লাগে, জলো জলো হাওয়া, যেন রাস্তার ধোঁয়াটাও কমেছে। একটা রিক্সা চলে গেল তার সামনে দিয়ে, খালি রিক্সা। আঃ, যদি বাবা এখন চলে আসত তো তারা এই রিক্সায় চেপেও বাড়ি যেতে পারত। এখন কি বাস বন্ধ হয়ে গেছে? ভাবল সে, আর একটু সময় কান খাড়া করে রাখল বড়রাস্তায় ট্রাম-বাস চলার শব্দ হয় কিনা শুনতে। কিছু বুঝতে পারল না। যেন এদিকে কোথাও কি একটা কলের চাকা ঘুরছে, তার বিশ্রী ঘসঘস শব্দ হচ্ছে। তাদের স্কুলের রাস্তায় একটা গেঞ্জির কলের এরকম শব্দ হয়। হয়তো এটাও গেঞ্জির কল হবে। চিন্তা করতে করতে তার চোখ দুটো হঠাৎ গোল হয়ে গেল, হৃদপিণ্ডটা একটা ছোট রকমের লাফ দিয়ে উঠল। গহনার দোকানের পাশের বাড়িটার গায়ে একটা নম্বর তার চোখে পড়েছে! ১৭বি, তা হলে সাত-এর সি বেশি দূরে নয়। এই রাস্তা যখন। ঘাড় ফিরিয়ে বাবলু দেখল কম্পাউণ্ডারটা চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তখনও গল্প করছে। এক-পা এক-পা করে রাস্তায় নেমে সে উল্টোদিক ধরে হাঁটতে লাগল। একটা দোকানে ছোট্ট একটা ঘড়ি তার চোখে পড়ল। দাঁড়িয়ে বাবলু সময়টা দেখল: আটটা পঁচিশ। দেখে সে অবাক হয়ে গেল। আটটা বাজতে না বাজতে বাড়িতে তার কী ভীষণ ঘুম পায়। বিশেষ শনি-রবিবার এলে, আটটা পর্যন্ত তার জেগে থাকা কষ্ট হয়। পড়া কম বলে ঘুমটা যেন শক্ত হাতে তার চোখ দুটোকে চেপে ধরে। শোভার মার রান্না নামে না। কিন্তু মুখে কিছু বলে না সে, প্রস্রাব পেয়েছে ভান করে দু-তিনবার পড়ার টেবিল ছেড়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে। আর এখন একফোঁটা ঘুম নেই চোখে। যেন বিজুদের সঙ্গে সে ফুটবল খেলার মাঠে যাচ্ছে, ঘুম আসতে অনেক দেরি। একটা ঘুঘনিওয়ালা

দেখে বাবলু থমকে দাঁড়ায়। 'কিছু চাই খোকাবাবু?' বাবলু মাথা নাড়ল, একটু ইতস্তত করল, তারপর ঢোক গিলে বলল, 'না, আমি ঘুঘনি খাই না, আমার পেট খারাপ।' ঘুঘনিওয়ালা চলে যায়, বাবলু বলে, 'আচ্ছা শোন, এদিকে সামনে একটা ডাক্তারখানা আছে না?' ঘুঘনিওয়ালা মাথা নাড়েঃ 'জানি না, বলতে পারি না খোকাবাবু?'

লোকটা চলে যায়, একটু সময় হতাশ হয়ে বাবলু সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আবার হাঁটে। 'আচ্ছা,' বাবলু এখন চিন্তা করতে লাগল, 'যদি এভাবে একলা সে এখন সেই ডাক্তারখানায় গিয়ে হাজির হয়, তো বাবা কি রাগ করবে? যদি বলে তোমায় আমি এক জায়গায় বসিয়ে এলাম, আর তুমি সেখান থেকে চলে এলে, অপরিচিত রাস্তা, তো বাবলু কি উত্তর দেবে?' বাবলুর বুকটা দুরদুর করতে লাগল। ঘুম পাচ্ছিল বলবে? ক্ষুধা পেয়েছে বলবে? ভয় করছিল? কোন্‌টা সত্তুত্তব হবে ভেবে সে ঠিক করতে পারে না। 'না, এমনও হতে পারে,' আবার সে ভাবল, 'দোকানটায় ভিড় বেশি, ওষুধের জন্য বাবা দাঁড়িয়ে আছে, লম্বা লাইন পড়েছে, দাঁড়িয়ে বাবা বাবলুর কথা ভাবছে দুশ্চিন্তা করছে। আর এ সময় সে নিজে থেকে সেখানে গিয়ে হাজির হলে বাবা খুশি হবে, বলবে, 'বেশ করেছিস, ভাল করেছ, আমি তোমার জন্যে এমন চিন্তা করছিলাম।' তাই কি? ভাবতে ভাবতে আরো চার-পাঁচটা বাড়ি সে পার হল, আর কোথাও আবার নম্বর চোখে পড়ে কি না— দেয়ালগুলো পরীক্ষা করতে করতে চলল। বেশির ভাগ বাড়ির গায়েই নম্বর নেই। 'শহরের এই ব্যবস্থাটা খুব খারাপ। নতুন রাস্তায় বাড়ি খুঁজে বার করা কত কষ্ট।' বাবলু নিজের মনে বলল, 'সব ক'টা বাড়ির গায়ে বেশ পরিষ্কার করে নম্বর লিখে রাখলে মানুষের কত সুবিধে হয়।' হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ায়। একটা রকের ওপর দুটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ সাজগোজ করা। কিন্তু

তাতে সে অবাক হয়নি—হুটো মেয়েই সিগারেট টানছে দেখে বাবলুর মনটা কেমন করে উঠল। মেয়েদের সিগারেট খেতে সে কোনদিন দেখেনি। বিজু সেদিন বলছিল, মেমসাহেবরা খুব সিগারেট খায়। সেদিন ইডেন গার্ডেনে নাকি সে নিজের চোখে একটা মেমকে সিগারেট টানতে দেখে এসেছে। শঙ্করও বলছিল সেদিন। কবে নাকি একটা টার্জনের ছবি দেখে সে। একটা মেম সিগারেট টানতে টানতে নৌকো বাইছিল। বাবলু এসব কোনদিন দেখেনি। এখন এ-পাড়ার হুটো মেয়েকে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে দেখে সে হাঁটা বন্ধ করে রীতিমত দাঁড়িয়ে রইল। এরা মেমসাহেব না, এরা বাঙালী মেয়ে, কলকাতার মেয়ে। ভাবল সে আর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের চোখ, নাক, কান, চুল, পোষাক দেখতে লাগল। এরা কাদের মেয়ে? মনে মনে সে প্রশ্ন করল। এ-বাড়ির? নাকি এ-বাড়িতে বেড়াতে এসেছে? তা রকে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন। ভিতরে যাবার দরজা তো খোলা রয়েছে। নিশ্চয় এ-বাড়ির। কিন্তু এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে দেখে ওদের বাবা-মা কিছু বলে না? ছি, ছি! বাবলুর খুব খারাপ লাগছিল। এরা কি স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে? নিজেকে জিজ্ঞেস করল ও। মস্ত বড় অফিসে চাকরি করে। তাই। অফিসে চাকরি করে টাকা-পয়সা রোজগার করে বলেই বাপ-মা কি দাদারা কিছু বলে না। বড়দের সামনে সিগারেট খেতে নেই, তাই এখানে বাইরে এসে খাচ্ছে। সমস্যাটার সমাধান হতে বাবলুর কিছুটা ভাল লাগল। হাঁটতে লাগল সে। বড় মেয়েটা কা'র মতন কা'র মতন? চিন্তা করল। যেন এরকম চেহারার একটা মেয়েকে সে আগে কোথাও দেখেছে। ভাবতে ভাবতে হুস্ করে তার মনে পড়ে যায়। অমলের সেই কোন্নগরের মাসি। অমলদের বাড়ি পুজোর সময় বেড়াতে এসেছিল। তবে অমলের মাসি আরো ফরশা। বেলা নাম। অমলের মাকে ডাকতে শুনছে সে। বাবলু আবার দাঁড়াল। হুটো মেয়ে, হুটো না

তিনটে,*চারটে—না আরো বেশি, বেশ বড় বাড়ির সদরে ঢুকবার রাস্তায় আবছা অন্ধকারে সার বেঁধে কিছু দাঁড়িয়ে। বাবলু হতভম্ব হয়ে গেল। এমন সাজগোজ ক'রে এখানে দাঁড়িয়ে সব করছে কি! কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে? এই রাস্তায় এখন কোনো প্রশেসন বেরোবে? ঠাকুর ভাসাতে নিয়ে যাবে? কি পূজো কোন ঠাকুর বাবলু মনে করতে পারল না। তেমন কোনো ভাল পূজো হলে তো তাদের স্কুলে ছুটি দিত কিন্তু দেয়নি তো। আব ভাল পূজো না হলে বড় ঠাকুর হত না এবং ভাসানের জন্য প্রশেসনও বার করা হবে না বাবলু ভাল করে জানে। তা হলে আর কি? বাবলুর একবার ইচ্ছা হল একজনকে জিজ্ঞেস করে তোমরা সব বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন। কিন্তু সাহস পেল না। এখানেও একটা মেয়ে সিগারেট টানছে,—না বিড়ি। বাবলুব গায়ে যেন কাঁটা দিল। শিউরে উঠল সে মেয়েটাকে বিড়ি খেতে দেখে। তারপর, তারপর ফস্ ক'রে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠাব মতন ছবিটা তার মনে পড়ে গেল। ভাল কথা কেবল মেমসাহেবরা কেন এদেশেও মেয়েছেলে সিগাবেট বিড়ি খায়। তাদেব পাড়ায় সনাতনবাবুদের নতুন দালানটা যখন তৈরী হয় বাবলু কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখত না সুড়কি মাখা হাত কাপড়ে মুছে সনাতনবাবুদের আতাতলায় বসে ছিপছিপে গড়নেব হিন্দুস্থানী মেয়েদুটো বিড়ি টানত—একদিন একটা মেয়েকে সে সিগারেট খেতেও দেখেছিল, আস্ত না, আধপোড়া একটা সিগারেট টিনের কৌটো থেকে বার করে ধরিয়েছিল। এতক্ষণ কথাটা তার মনে পড়ছিল না বলে বাবলুর দুঃখ হ'ল এবং হাসিও পেল। এক টুকরো হাসি মুখে নিয়ে সে হাঁটে। একটা মেয়ের চুলেব কাঁটা খুলে গেছে যেন, আর একটা মেয়ে গুঁজে দিচ্ছে। দুটিতে মুখের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে কি বলে তারপর একসঙ্গে খিলখিল করে হেসে ওঠে। এত জোরে ওরা হাসে যে গলিটা কাঁপতে থাকে। 'না' মনে মনে বলল সে,

"আমাদের পাড়ায় কি বিজু বা শঙ্করদের পাড়ায়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা এত জোরে হাসে না। তা-ও রাত করে। এ পাড়াটা অন্যরকম। অনেকদিক থেকে অন্যরকম বাবলু প্রথম থেকে লক্ষ্য করছে। সেই ডিস্পেন্সারীর ঘাড়মোটা টাকপড়া ডাক্তার, ঘেয়ো কম্পাউণ্ডার আর গহনার দোকানের মেয়েটাকে দেখে তার মনে হয়েছে। তাদের হাসি কথা হাতমুখ নাড়া চাউনি সবই যেন কেমন কেমন। বাবলু হাঁটতে লাগল। আর একটা বাড়িরও নম্বর তার চোখে পড়ছে না। এতক্ষণ তবু সে সতেরোর বি থেকে একটা একটা নম্বর বাদ দিয়ে বাড়িগুলোর হিসাব রেখে চলছিল,—এভাবে যদি সাত-এর সি পাওয়া যায়। কিন্তু এক জায়গায় এসে সব গুলিয়ে গেছে। এতগুলো রক বারান্দা নিয়ে ওটা কি একটা গোটা বাড়ি না প্রত্যেকটার আলাদা নম্বর বুঝতে না পেরে কেমন মুশকিলে পড়ে গেল ও। তার কপাল ঘামছিল। এখানে না হলেও কুড়িটা মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল বাবলু। তারা আরো জোরে হাসছে, কথা বলছে। একটা মেয়ে শিস দিচ্ছে। পাশের কালো মেয়েটা দেখতে অবিকল বিজুর বড়দির মতন। অবশ্য বিজুর বড়দির বিয়ে হয়ে গেছে। এটির হয়নি। এখানে অনেক মেয়েরই বিয়ে হয়নি যেন। কারো কারো মাথায় সে সিঁদুর দেখছে যদিও। আর, একটা পাড়ায় যে এমন অগুনতি মেয়ে থাকতে পারে বাবলুর ধারণায় ছিল না। নিশ্চয় একটা কিছু হবে, আবার ভাবে সে, কিছু দেখতে সব দল বেঁধে সেজে গুজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা রকের গা ঘেঁষে বাবলুকে হাঁটতে হয়। কড়া আতর এসেন্সের গন্ধ তার নাকে লাগে। অনেকদিন পর একটা তেলের গন্ধ তার নাকে লাগল। কিছুক্ষণের জন্য বাবলু স্বপ্নাচ্ছন্নের মত হয়ে হাঁটল। কেননা গন্ধটা তার শৈশবের স্মৃতিকে জাগিয়ে দিয়েছে। যেন কিছু মনে পড়ছে—কিছু মনে পড়ছে না। তার মা এই তেল চুলে মাখত। তখন বাবলুর ঠিক কত বয়স ছিল মনে নেই। তবে সেদিন তার

মা বিছানায় শুয়ে থাকত না। চলাফেরা করত, রান্না করত, বাবলুকে নিজের হাতে খাইয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে দিত। বাবা খেতে বসলে মা পাশে দাঁড়িয়ে থাকত এটা ওটা এগিয়ে দিত, অফিস থেকে ফিরে এলে চা জলখাবার করে দিত। তারপর কবে থেকে যে মা অসুখে পড়ল। আর তাদের সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল, বাবলু ভাল মনে করতে পারে না। কেবল মনে আছে এই অদ্ভুত গন্ধ, সুগন্ধ তেলটার কথা। এত বড় একটা কচিপাতা রঙের চিরুণি দিয়া মা চুল আঁচড়াত। ধোঁয়া ধোঁয়া বাবলুর মনে পড়ে। মুখ তুলে সে মেয়েটার দিকে তাকায়। লম্বা গড়ন। চোখে চশমা। কলেজের মেয়েদের মতন বেণী। কিন্তু আর পাঁচটা মেয়ের মতন এত হাসছে না বা কথা বলছে না। একটু গম্ভীর। বাবলুর ইচ্ছা করছিল ওর সঙ্গে কথা বলে। এধারে একটা ডিস্পেন্সারী আছে কিনা ওকেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেয়। হয়তো বাবলু এক পা এগিয়েও গিয়েছিল। তারপর আর এগোতে পারল না। প্রায় বাবলুর গায়ে ধাক্কা মেরে বেশ উঁচু লম্বা মতন একটা লোক মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ফুসফাস কি বলতে মেয়েটা ঘাড় নাড়ল তারপর দুজন হাত ধরাধরি ক'রে রক ছেড়ে ভিতরের বারান্দায় ঢুকে পড়ল। এমন কষ্ট হ'ল বাবলুর মনে। লোকটা কে ভেবে সে কিছু ঠিক করতে পারল না। 'ওর কাকা? ওর দাদা?' নিজেকে প্রশ্ন করল বাবলু। তারপর নিজেই উত্তর দেয়: 'কাকা দাদা এভাবে হাত ধরে না।' তার স্বল্প পরিসর জীবনের অভিজ্ঞতায় এইটুকু যেন কি করে জানা হয়ে গেছে। ভাবল, নিশ্চয় দাদার বন্ধু হবে। নিশ্চয় এই লোকটা মেয়েটাকে বিয়ে করবে। তাই এত ফিসফাস। তাদের ক্লাসের বিশুর দিদিকে যে লোকটা বিয়ে করল সে-ও তো বিশুর দাদার বন্ধু, আর বিয়ের আগে থাকতেই ওদের বাড়ি যেত। বিশুদের বাড়ি লুডো খেলতে গিয়ে বাবলু ক'দিন দেখেছে। একটা ছোট্ট নিশ্বাস

ফেলে সে হাঁটে। এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়ায়। একটা লোককে দু' তিনজন লোক ধরে রেখেছে। লোকটা হাঁটু ভেঙ্গে যেন পড়ে যাচ্ছে আর আবোল তাবোল বকছে। আর তাই দেখে সামনের রকের মেয়েগুলো খিলখিল ক'রে হাসছে। একটা মেয়ে পান খাচ্ছিল। হাতের পানের বোটাটা লোকটার গায়ে ছুঁড়ে দিতে লোকটা রাগ করল না, দাঁত বার ক'রে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে হি হি করে হাসল আর—বাবলুর কান লাল হয়ে উঠল। 'ইস্ কী অসভ্য লোকটা' অস্ফুটে বলে ফেলল সে। যেন সেদিকে তাকাতে তার লজ্জা করছিল। আর, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এপাড়ার মেয়েরা এমন অসভ্য কথা বলে! যেন সেখান থেকে ছুটে পালাতে পারলে তার ভাল লাগত। কিন্তু তা আর কি করে হবে, বাবাকে না পেলে? বাবলু মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল। তবে কি ডিস্পেন্সারীটা সে খুঁজে পাবে না। না কি পিছনে ফেলে এল। কান্না পেতে লাগল তার। কি করবে এখন? কাউকে জিজ্ঞেস না করে উপায় কি। ভাবতে ভাবতে তাব হঠাৎ মনে পড়ল লাইটপোস্টের গায়ে দোতালা বাড়ির কথা টাকপড়া ডাক্তারটা বলছিল। তবে তো ওই বাড়িটা। তা ছাড়া ওরকম বাড়ি তো তার চোখে পড়ল না। ঢোক গিলে বাবলু গুটি গুটি হাঁটে। লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে সে ওপরের দিকে তাকায়। যেন একটি মেয়ে গান গাইছে। তবলা হার্মোনিয়ম বাজছে সঙ্গে। নিশ্চয় ওপরের ভাড়াটেদের মেয়ে কি বৌ। কিন্তু নীচে ডিস্পেন্সারী তো চোখে পড়ছে না। বারান্দার সবটা জুড়ে প্রকাণ্ড রক। আর রকের ওপর সার বেঁধে কম সে কম আট দশটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। ইতস্তত করে সে সবচেয়ে ছোট মেয়েটির সামনে এগিয়ে গেল। দূর থেকে যতটা ছোট সে মনে করেছিল কাছে গিয়ে দেখল আসলে মেয়েটি তা না। মুখটা বেশ পেকে গেছে, চোখ দুটোর নিচে কালচে দাগ, হাতের আঙুলগুলো শুকনো শুকনো। মুখ খুলতে বাবলু ওর দোক্তপানের

দাগ ধরা কালো দাঁতগুলো দেখতে পেল। 'ডিস্পেন্সারী? ডাক্তারখানা?' বাবলুর প্রশ্ন শুনে মেয়েটি অবাক। 'এ বাড়িতে তো সে সব কিছু নেই, তুমি কার ছেলে বাছা?'

বাবলু মুখ নিচু করল।

লম্বা মতন একটা মেয়ে এগিয়ে এসে বাবলুর মাথায় হাত রাখল: 'আহা, কেমন চাঁদপানা মুখ গো, তুমি কাদের ছেলে খোকা?'

বেঁটে মেয়েটা বাবলুর হাত ধরল। 'তোমার বাবার নাম কি?'

বাবলু চোখ তুলল: 'শ্রীসত্যেন রায়।'

'কি বললে, কি নাম বললে?' মোটা একটা মেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। বেঁটে মেয়েটা বলল, 'সত্যেন রায়।'

মোটা মেয়েটা তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়ল ও জিহ্বার একটা মৃদু শব্দ করল: 'চিনেছিস? সেই যে টাইস্যুট পরা ভদ্দরলোক। আগে তিন নম্বরের হিমির ঘরে যেত। আজ তো দেখলাম মুকুলের ঘরে গেছে।'

'মুকুল?' বেঁটে মেয়েটা চোখ বড় করল।

মোটা মেয়েটা মাথা নাড়ল: 'নতুন এসেছে। শ্যামলা রং, জোড়া ভুরু, কাল সকালে তো এল, দেখেছিস।'

'অ বুঝেছি, বুঝেছি।' কেবল বেঁটে মেয়েটা না, লম্বা মেয়েটা ও আরো দু' তিনটা মেয়ে একসঙ্গে কথা কয়ে উঠল। সবাই এখন বাবলুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। মোটা মেয়েটা বাবলুর গলায় হাত রেখে আদরের সুরে বলল, 'তা তুমি এখানে কি করে এলে বাবা?'

'বাবা আমাকে গলির ওধারের ডাক্তারখানায় বসিয়ে রেখে মার ওষুধ কিনতে চলে এল, তবে তো এটা সাত-এর সি না!' বিজ্ঞের মতন বাবলু কথাটা বলে ফেলে ঘামতে থাকে। একটু সময় চিন্তা করে।

'ইস্ ইস্!' সবগুলো মেয়ে আবার একসঙ্গে জিহ্বার হিস্ হিস্

শব্দ করে উঠল : 'কি আক্কেল ভদ্দরলোকের, ছেলে সঙ্গে নিয়ে পাড়ায় ঢুকেছে।'

'তা ডেকে দিবি নাকি?' বেঁটে মেয়েটা প্রশ্ন করতে মোটা মেয়েটা ঘাড় নাড়ে : 'কচি খুকির মত কথা বলছিস কনক। এভাবে এখন ডেকে দেওয়া যায় নাকি?'

'তার চেয়ে ও সেই ডাক্তারখানায় গিয়ে অপেক্ষা করুক না।' একটু বেশি বয়সের একটা মেয়ে প্রস্তাব দেয়। বাবলু ফ্যালফ্যাল করে সকলের মুখের দিকে তাকায়। কিছুই বুঝতে পারছে না সে। যদি এটা ডিস্পেন্সারী না হবে তো তার বাবা এখানে আসবে কেন। ওরা আজে বাজে সব কথা বলছে। মেয়েগুলো ফাজিল। তার সঙ্গে দুষ্টামি করছে। 'আমায় ছেড়ে দাও, আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাবার কাছে যাব।' লম্বা মেয়েটা তার গলায় হাত রাখতে বাবলু চিৎকার করে উঠল। 'তোমার বাবা এখানেই আছে সোনামণি, কোথায় খুঁজতে যাবে রাত হয়েছে, তোমার বাবা এক্ষুনি বেরোবে।' বলতে বলতে মেয়েটা বাবলুকে বুকে চেপে ধরে চুমো খেল। 'দে দে আমায় দে।' লম্বা মেয়েটা মুখ বাড়িয়ে দিল : 'আহা কতদিন এমন ছোট ছেলেকে বুকের কাছে পাই না রে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে আরো দুটো মেয়ে মুখ বাড়িয়ে দেয় : 'আমায় দে না রে ভাই, আহা কী মিষ্টি চেহারা!' বাবলুর শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়, হাত-পা ছুঁড়ে উঃ আঃ শব্দ করতে থাকে। 'কি করছিস তোরা, দেখছিস না কেমন করছে, এখুনি কান্নাকাটি শুরু করবে,—না বাবা তুমি সেই ডাক্তারখানায় গিয়ে বসো, তোমার বাবা এবাড়িতে আছে, মুকির ঘর থেকে বেরোক আমরা বলব'খন।' বেশি বয়সের মেয়েটা বাবলুর হাত ধরে সকলের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিতে বাবলু হাত দিয়ে গাল মোছে কপাল মোছে। পানের গন্ধ, যেন আরো কিসের গন্ধ তার নাকে লাগে। বাবলু ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে লাগল, আর কটমট করে মেয়েগুলোকে দেখতে

লাগল।০ সব তার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসছে, কারো কারো চোখ ছলছল করছে। যেন এদের ওপর রাগ করতে গিয়েও তেমন করে রাগ করতে পারছিল না সে। কি বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে তার কথা সরল না। বেশি বয়সের মেয়েটা বাবলুর মাথায় হাত বুলোয়ঃ 'ছাখো দিকিনি, একেবারে লাল করে দিয়েছে, বলি অত যদি ছেলের সখ তোদের তো এ লাইনে এলি কেন লা মুখপুড়িরা।' তার ধমক শুনে কেউ হাসল কেউ গম্ভীর হয়ে রইল। এমন সময় দোতলার সিঁড়ি বেয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে এল আর একজন। বাবলু দেখে রীতিমত ভয় পেল, উস্কুখুস্কু চুল, আঁচলটা মাটিতে লুটোচ্ছে, আর কী ভীষণ মোটা মেয়েটা! পা দুটো টলছে, কাঁদছে ওঃ 'আয়, আয় মাণিক আমার বুকে আয়, ওপর থেকে দেখেই তো চিনে ফেললাম, আমার মাণিক আবার ফিরে এয়েছে গো, ওহো হো হো……।' 'এই মানু ভিতরে যা।' বয়স্কা মেয়েটা বাবলুকে আগলে রাখেঃ 'এখানে এসে তুই মাতলামি আরম্ভ করলি।' কিন্তু মাতাল তা শুনবে কেন, টলতে টলতে বাবলুর গায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েঃ 'আয় রে মাণিক, আয় আয়, আমার বুক খালি রেখে তুই কতকাল লুকিয়ে থাকবি, আয় বাবা আয় আয়।' 'এই মানু, এই, করিস কি, পাগলামী করবার জায়গা পেলিনি, রাস্তার ওপর—' বয়স্কা মেয়েটি মানুর সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিতে অন্য মেয়েগুলো খিলখিল করে হেসে উঠলঃ 'এই বেলা ঠ্যালা সামলা সদি। এমনি তো আজ সারাদিন মদ গিলেছে, তার ওপর এখন বাচ্চা ছেলে চোখে পড়েছে মানুর, ছেলের শোক তো উথলে উঠবেই।' সদি মানে বয়স্কা মেয়েটা কিন্তু মানুকে কিছুতেই বাবলুকে ছুঁতে দিচ্ছে না। ধ্বস্তাধ্বস্তি করতে গিয়ে সদিরও গায়ের আঁচল মাটিতে লুটোয়, খোঁপা ভেঙ্গে যায়, যেন ব্লাউজের একটা হাতার খানিকটা পট পট শব্দ করে ছিঁড়ে গেল। এবার মানুর চুলের মুঠি ধরে সদি জোরে

ঝাঁকুনি দেয়, আর মাতালের সে কি চিৎকার! 'আমায় মেরে ফেললে গো আমায় মেরে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে, আমার বুকের ছেলে কেড়ে নিয়ে শতেকখাকীরা এখন আমায় মারছে। আমি কোথায় যাব গো, ও হো হো হো—'

'এই রাস্তামে ঝামেলা মৎ করো, আন্দরমে ঢোক, ঘরমে যাও......' বুটের ঠক ঠক শব্দ: পুলিস! একটা দৌড়ঝাঁপ আরম্ভ হল। রাস্তার মেয়েগুলো রকে উঠল, রকের মেয়েগুলো ছুটে ভিতরে চলে গেল। মাতালকে অবশ্য ওরা ফেলে গেল না, তিন-চারজন মিলে অতিকষ্টে মোটা মানুকে টেনে তুলে ভিতরে নিয়ে গেল। কিন্তু পুলিসটা হাতের লাঠি ঘুরিয়ে তখনও হাঁকডাক করে দেখে আর একটি মেয়েও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে না। রকটা একেবারে ফাঁকা হয়ে যায়। সেই ফাঁকে বাবলু টুক করে সেখান থেকে সরে পড়ে। কোনদিকে যাবে ঠিক করতে না পেরে সে বাঁদিকে আর একটা সরু রাস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। সামনেই একটা প্রস্রাবখানা। বাবলু সেটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। তার পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করছে। তাকে নিয়েই মেয়েগুলো গোলমাল করছিল, ঝামেলা পাকিয়েছিল, পুলিস তো তাকেই ধরত, কেন জানি বাবলুর মনে হল। সেই জন্যই এত ভয় হচ্ছিল তার। না হলে পুলিস দেখে সে এখন আর ভয় পায় না। শঙ্কুটা আজও রাস্তায় ঘাটে পুলিস দেখলে ঘাবড়ে যায়। মুখে কথা সরে না। কিন্তু বাবলুর তা হয় না। সেদিন ক্লাশে ইতিহাসের মাস্টার মশায় বলছিলেন, পুলিস ভাল লোককে কিছু করে না। চোর বদমায়েসকে ধরে গুণ্ডা লোককে ধরে। পুলিস বরং লোকের ভালই করে। সেই থেকে বাবলুর পুলিসের ভয় কেটে গেছে। কিন্তু আজ সে এই অবস্থায় পড়বে কে জানত। প্রস্রাবখানার তীব্র গন্ধ তার নাকে ঢুকছিল। তা সত্ত্বেও চুপ করে সে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়ায়, অপেক্ষা করে, পুলিসটা চলে যাক,

ভাবে সে, তারপর বাবাকে খুঁজে বার করবে। অন্ধকারে সে মোটা মেয়েটার কথা চিন্তা করল। মেয়েটার অদ্ভুত চাউনি, ভেউ ভেউ কান্না বাবলু ভুলতে পারছে না। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস তার মনে পড়ে তাকে অশান্তি দিচ্ছে। মেয়েটার মুখের গন্ধ। সেই বড় মেয়েটার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে মুটকি মেয়েটা যখন বাবলুকে ধরতে এসেছিল, তখন গন্ধটা বাবলুর নাকে লেগেছে। পানদোক্তা সিগারেটের গন্ধ না, অন্যরকম গন্ধ। মাতাল। বলছিল সবাই। সন্ধ্যা থেকে মদ গিলে মুটকিটা নাকি ওরকম করছিল। তবে কি ওটা মদের গন্ধ! তবে কি—বাবলুর গা শিরশির করতে লাগল চিন্তা করে। তবে কি—প্রস্রাবখানার অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে থেকেও কথাটা নিজের কাছে স্বীকার করতে তার লজ্জা করছিল, ভয় হচ্ছিল। এই গন্ধ সে বাবার মুখে পেয়েছে। একদিন না, দুদিন না, আরো বেশি! অনেক রাতে বাবা যখন ঘরে ঢোকে কেন জানি আপনা থেকে বাবলুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। হয়তো দুশ্চিন্তায়। মাব জন্য চিন্তা কবে মাঝে মাঝে তার এমন হয়। 'তোর বায়ু চড়া হয়েছে।' বিছানায় শুয়ে থেকে মা কাতরাতে কাতরাতে বলে, 'উঠে ঘাড়ে কানে একটু জলের ছিটা দে, ঘুম আসবে।' বাবলু তাই কবে। ঘবে ফিবে কাপড়-জামা ছেড়ে বাবা হয়তো তখন বাথরুমে ঢুকেছে। কিন্তু ঘরময় গন্ধটা ছড়িয়ে থাকে। এই গন্ধ, এই—

কিন্তু, বাবলু আবার ভাবল, মদ খেলে তো লোকে মাতলামি করে। মুটকি মেয়েটা তখন মাতলামি করছিল। তাদের স্কুলেব পিছনে ছোট্টা একটা টিনের ঘরে একটা মুচি জুতো তৈরী করে। একদিন দুপুরে মুচিটা ভীষণ মাতলামি করছিল। সবাই বলছিল ভিখু মদ খেয়েছে। টিফিনের ঘণ্টায় শঙ্কু-বিজু-তাপস-সোমেনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বাবলু ভিখুর কাণ্ড দেখছিল। ভিখু কখনো হাসছিল কখনো ভেউ ভেউ করে কাঁদছিল। কিন্তু তার বাবা তো

কোনোদিন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরে ওরকম করে না। তেমনি গম্ভীর তেমনি চুপচাপ। . তবে কি—বাবলু সমস্যায় পড়ল। 'নিশ্চয় মদের গন্ধের মত আর কোন জিনিস আছে, হয়তো বাবা তাই খেয়ে বাড়ি যায়, মদ না। 'না না আমার বাবা কক্ষনো মদ খেতে পারে না।' মনে মনে বলল সে। বলে মনকে শান্ত করল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আর একটা চিন্তা তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। 'তোমার বাবা মুকুলের ঘরে আছে, এক্ষুনি বেরোবে, একটু অপেক্ষা কর।' লম্বা মেয়েটা তখন বলল কেন? বাবলু দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। যেমন তার গণিতাঙ্কুরের তিন নম্বর প্রশ্নমালার কঠিন অঙ্কগুলো কষতে বসে সে ঠোঁট কামড়ায়। এভাবে ঠোঁট কামড়ে থেকে সে ফল পেয়েছে। প্রায় সবগুলো অঙ্ক তার করা হয়ে গেছে। আর মাত্র পাঁচটা অঙ্ক বাকি। সেগুলোও সে করতে পারবে। এখনও বাবলু জটিল বিষয়টা চিন্তা করতে সেই পন্থা অবলম্বন করল এবং বলতে গেলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফল পেল। প্রশ্নটার উত্তর যেন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দেয়। একদিন অমলের সঙ্গে সে লিন্টন স্ট্রীটের একটা মনোহারী দোকানে কাজু বাদাম কিনতে গিয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল আর পাঁচটা মনোহারী জিনিসের সঙ্গে যদি দোকানী লজেন্স বিস্কুট রাখতে পারে, তবে কাজু বাদামও রাখবে। কিন্তু বাদামের কথা শুনেই দোকানী কি বলল? 'একটু দাঁড়াও ভাই, ফুরিয়ে গেছে বাদাম, এক্ষুনি বড়বাজার থেকে গাড়ি এসে পৌঁছবে, তিন বাক্স কাজুবাদাম আসছে। ক'সের চাই?' 'এক ছটাক।' অমল বলছিল। গম্ভীর হয়ে দোকানী বলছিল, 'তাই পাবে, আমরা সের সের বাদাম বিক্রি করি আবার ছটাক কাচ্চাও বিক্রি করি।' দোকানে দাঁড়িয়ে দু'জন অপেক্ষা করে আর রাস্তার দিকে তাকায় কখন বড়বাজারের গাড়ি এসে পৌঁছবে। এদিকে দোকানী অমলের পিঠে হাত বুলোয় মাথায় হাত বুলোয়, বাবলুর মাথায় হাত বুলোয় পিঠে হাত বুলোয়, আর হেসে হেসে প্রশ্ন করে:

কোন্ স্কুলে পড়ছে দুটিতে, কোন্ ক্লাসে আছে এখন, তাদের ওপর ক'জন চেপেছে। শেষের প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে অমল একটু অবাক চোখে দোকানীর মুখ দেখছিল। লোকটা তৎক্ষণাৎ শব্দ করে হেসে ওঠেঃ 'মানে জিজ্ঞেস করছি, ক্লাসের পরীক্ষায় ক'জনের তলায় আছ তোমরা?' বুঝতে পেরে বাবলুও জোরে হেসে উঠেছিল। তারপর দোকানী আরো মজার কথা বলছিল। একদিন নাকি সে নিজের চোখে, বাবলুদের হেডমাস্টার মশায়কে জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের একটা চীনা রেস্টুরেন্টে বসে পেঁয়াজ-কুচি আর টম্যাটো দিয়ে কচ্ছপের ডিমভাজা খেতে দেখেছে, একদিন নাকি তাদের ইংরেজির মাস্টারকে গড়ের মাঠের একটা কোণায় একটা গাধার বাচ্চা ধরে সেটার ওপর চেপে বসে 'ঘোড়ায় চড়া' শিখতে দেখেছে। অর্থাৎ দোকানী যে ছেলেমানুষ পেয়ে দুজনের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করছিল, তা তারা বেশ বুঝতে পারছিল। বুঝতে পারছিল আর দরজায় চোখ রেখে অপেক্ষা করছিল, কখন বড়বাজারের গাড়ি তাজা কাজুবাদাম নিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়াবে। আরো কিছু সময় কাটতে তারা দোকানীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই, আপনার গাড়ি তো এখনো এলো না মশাই।' গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে দোকানী উত্তর দিয়েছিল, 'দাঁড়াও আমি টেলিফোন করে জেনে নিচ্ছি, কি ব্যাপার, এখনো গাড়িটা আসছে না কেন।' বলে সে দোকানের পিছনে একটা পার্টিশানের আড়ালে গিয়ে এক মিনিট পর পান চিবোতে চিবোতে ফিরে আসে। 'হ্যাঁ ভাই, বড় দুঃসংবাদ। টেলিফোন করতে বড়বাজারের ওরা বলল, জাঞ্জিবার থেকে কাজুবাদাম নিয়ে জাহাজটা গঙ্গার ঘাটে এসে আর ভিড়তে পারেনি, সমুদ্দুর পেরিয়ে যখন গঙ্গায় ঢুকছিল, তখন চড়ায় আটকে জাহাজের তলা ফুটো হয়ে ওঠা সেখানেই তলিয়ে যায়। তা তোমরা যদি এক্ষুনি ধরমতলার একটা গ্রামোফোনের দোকানে চলে যাও, তো সেখানে ছটাক কেন দুতিন মণ কাজুবাদাম

কিনতে পার। তাদের স্টকে এখনো অনেক বাদাম আছে। আমি দোকানের নম্বরটা টুকে দিচ্ছি।' অমল আর বাবলু ক্ষুণ্ণ হয়ে তৎক্ষণাৎ দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। লোকটা যে প্রথম থেকে তাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিল, তা তাদের বুঝতে আর বাকি রইল না। 'এখানেও তাই।' বাবলু মনে মনে বলল, 'এ পাড়ার মেয়েগুলো তো এমনি ফাজিল। তার ওপর যে বাড়িতে ডিস্পেন্সারী থাকবার কথা নয়, যেখানে তার বাবার যাবার কথা নয়, সেখানে গিয়ে তাঁর কথা জিজ্ঞেস করেছিল বলেই তো মেয়েগুলো তাকে পেয়ে বসেছিল। বাচ্চা ছেলে দেখে আরো কতরকম ঠাট্টা ওরা করত কে জানে। হয়তো আরো কিছুক্ষণ ওরা তাকে ধরে রাখত, আর চুমো খেতো। মাঝখানে মাতাল মেয়েটা এসে পড়াতে সব গোলমাল হয়ে গেল।

'বাবা সেখানে নেই, আমারই ডিস্পেন্সারীর বাড়িটা খুঁজে পেতে গোলমাল হচ্ছে।' চিন্তা করে সে প্রস্রাবখানার আড়াল থেকে বেরিয়ে এক পা এক পা করে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। যেন আকাশ থেকে ত্নটো জলের ফোঁটা তার কানে মাথায় পড়ল। চিন্তিত হয়ে বাবলু ওপরের দিকে তাকায়। একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না। হাওয়াটা বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো এখনি বৃষ্টি পড়তে শুরু করবে, কি শুরু হয়ে গেছে। বাবলু একটু তাড়াতাড়ি পা চালায়। যেন কোন্‌দিকের একটা দোকানে মাংস রান্না হচ্ছে। চমৎকার গন্ধ ছড়িয়েছে। বাবলুর এই প্রথম মনে হল তার ক্ষিধে পেয়েছে। অথচ পুলিস দেখে ভয় পেয়ে সে যখন প্রস্রাবখানার মধ্যে ঢুকেছিল, তখন তার কী ভীষণ পায়খানা পেয়েছিল। সামলাতে কষ্ট হচ্ছিল। আবার নতুন জায়গায় পায়খানা করতেও সাহস হয়নি তার। এখন বেগটা একেবারে নেই, বরং খুব ক্ষিধে লেগেছে টের পেয়ে বাবলু একটু অবাক হয়। তারপর ভাবল পুলিসের ভয়েই তার ওরকম হয়েছিল, আসলে—পানুবাবু

মানে ইতিহাসের মাস্টারমশায়ের আর একটা কথা সাঁ করে বাবলুর মনে পড়ে যায়। কথাটা মনে পড়ে তার আফসোস হয়। 'পথে বেরিয়ে ঠিকানা ভুলে গিয়ে যদি তোমরা কখনো অসুবিধায় পড় বা কোন বাড়ি বা রাস্তা খুঁজে না পাও তো ধারে-কাছে পুলিসম্যান থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করবে সে বলে দেবে।' আর বাবলু কিনা পুলিসটাকে দেখেই পড়ি-মরি করে দৌড় দিয়েছিল। পুলিসটাকে বললে নিশ্চয় সে ডিস্পেন্সারীর বাড়িটা খুঁজে দিত।

একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে বাবলু এগোয়। যদি পুলিসটা এখনো সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে। মেয়েগুলো নিশ্চয় আর বাইরে আসেনি। না বাবলু আর মোটেই ভয় পাবে না। এবার সে পুলিসটাকে সোজা জিজ্ঞেস করবেঃ 'সাত-এর সি আমাকে খুঁজে দাও। আমার মার ইঞ্জেকশন কিনতে আমার বাবা সেখানে আছে। ওটা একটা ডাক্তারখানা, হ্যাঁ দাবাখানা। যদি পুলিসটা বাঙলা বুঝতে না পারে তো সে হিন্দীতে বলবে। দাবাখানা শব্দটা বাবলু কবে কার কাছে শুনেছিল মনে করতে পারল না। কিন্তু শব্দটা জানা আছে বলে সে খুশি হয়। 'ঈশ্বর! ঈশ্বর!' সে আবার ঈশ্বরকে ডাকলঃ 'আমি যেন এখনি পুলিসম্যানটাকে পেয়ে যাই, আর, ভয় না করে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমায় সাহস দাও।' বাবলু মুড়ি-মুড়কীর দোকানটাও পার হ'ল। তার পরিষ্কার মনে নেই—কোনদিক দিয়ে ঘুরে সে এখানে ঢুকে পড়েছিল। একটা মিষ্টির দোকান। তার পরেই মোড়। মোড়টা পেয়ে সে নিশ্চিন্ত হয়। আর ভুল হল না রাস্তাটা পেতে। বাবলু লক্ষ্য করল রাস্তায় এখন লোকজন কম। রক-বারান্দাগুলো বেশ ফাঁকা। দু'টো একটা মেয়ে চোখে পড়ছে কি পড়ছে না। কিন্তু পুলিসম্যান? পুলিসটাকে না দেখে সে হতাশ হয়। 'তবে যদি ওখানে এখনো দাঁড়িয়ে থাকে।' ভাবল আর একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেই সে দোতলা বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল। 'নিশ্চয় মাতাল মেয়েটা আবার

রাস্তায় এসে যাতে গোলমাল না করে, তাই সেখানে দাঁড়িয়ে পুলিসটা পাহারা দিচ্ছে।'

তখন ছুটতে গিয়ে পা-টা কেমন মচকে যায়। এখনও একটু একটু লাগছে। কিন্তু বাবলু তা গ্রাহ্য করে না। তার সহ্য করার ক্ষমতা যে কত বেড়ে গেছে সে এখন আবার অনুভব করল। কি, বাবাকে পেলেও সে এসব কথা কিছুই বলবে না। না, বাড়িতে গিয়ে মাকেও না, চুপ করে থাকবে। বাবা মার ইঞ্জেকশন কিনে নিয়ে যাচ্ছে এটাই বড় কথা। এই আনন্দে সে হয়তো আরো বেশি ব্যথা-বেদনা ভুলে থাকতে পারবে।

'বাবা!' উল্লাসে চিৎকার করে উঠত সে, কিন্তু তা তো হল না; যেন গলা দিয়ে তার আওয়াজই বেরোল না। যেন মুহূর্তে তার কি হয়ে গেল। পা সরে না। কেবল বুকের ভিতরটা দুরদুর করে। হ্যাঁ, তার বাবা। বাবা ছাড়া আর কে হবে। টাইস্যুট-পরা কোঁকড়া চুল, ফরশা মুখ, লম্বা শরীর। মেয়েটাও খুব লম্বা। কিন্তু অন্য মেয়েগুলো মানে একটু আগে বাবলু যাদের দেখে গিয়েছিল, তারা কেউ নেই। মাতাল মেয়েটা নেই। পুলিসটা ধারে কাছে কোথাও আছে কি না ঘাড় ফিরিয়ে বাবলু এদিক ওদিক তাকায়, কিন্তু দেখতে পায় না। দোতলা বাড়ির সামনেটা এখন একেবারে ফাঁকা। কেবল দুজন রকে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, মেয়েটা হাসছে, বাবা ঠিক হাসল কিনা বাবলু বুঝতে পারল না। 'কি কথা বলছে ওরা?' চিন্তা করবার আগে বাবলু ভাবে, সে এখন কি করে। কি আর করবে বাবার কাছে যাওয়া ছাড়া। তাই শামুকের মতন সে একটু একটু করে এগোয়, তারপর রকটা ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়ায়। ভাগ্যিস সিগারেটের ছাই ঝাড়তে বাবা ঘাড় ফেরায়। অবাক হয় না বাবা, কেবল ভুরু দুটো কুঁচকায়, বাবলু লক্ষ্য করল। 'এরি মধ্যে চলে এলে কেন, ওরা কি দোকান বন্ধ করে চলে গেছে?' কথা না কয়ে মুখ নামিয়ে বাবলু মাথা নাড়ে। 'ভয় করছিল বুঝি, কেন

ডাক্তারবাবু দোকানে ছিলেন না?' বাবলু এবারও নিরুত্তর, অধোবদন। 'চলো, এই বেলা আমরা বাড়ি যাব—এই এই রিক্সা!" ঠুনঠুন আওয়াজ থামিয়ে রিক্সাটা দাঁড়ায়। এতক্ষণ পর একটা হাঁল্কা নিশ্বাস ছেড়ে বাবলু মুখ তুলতে পারল। 'চলি।' মেয়েটা ঘাড় বেঁকায়, অর্থাৎ বাবলু এসে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কথা শেষ হয়ে গেছে এটুকু ও বুঝতে পারল। কিন্তু বাবলুর দুঃখ হল এ মেয়েটা তার দিকে একবার তাকাল না পর্যন্ত, যাবার সময়ও না। অথচ সে ভেবেছিল অন্য মেয়েগুলোর মত এই লম্বা মেয়েটিও বাবলুকে দেখা মাত্র জড়িয়ে ধরে আদর করবে চুমো খাবে। কিন্তু সেসব কিছুই হল না। চটার চট চটির আওয়াজ তুলে ভিতরে চলে গেল। শ্যামলা রং, জোড়া ভুরু এবং মুখখানা যেন অন্য মেয়েগুলোর চেয়ে একটু বেশিই মিষ্টি। কিন্তু অহঙ্কারী, বাবলু চিন্তা করল। না, তার কষ্ট হতে লাগল এই জন্য যে, বাবা আর কাবোর সঙ্গে কথা বলেনি, ওর সঙ্গে কথা বলেছে হয়তো ওর কাছেই ছিল এতক্ষণ, আর ও কিনা একবাব ঘাড় ফিরিয়ে বাবলুকে দেখল না।

'পা গুটিয়ে সুন্দর করে বসো।'

বাবার কথামতন বাবলু তাই করল। রিক্সায় টান পড়ল। এমন সময়। উঃ, সে কি কান্না, কি চিৎকার! 'মাণিক, আমার মাণিক চলে যাচ্ছিস!' 'এই এই মাগি!' বাবা চিৎকার করে উঠল, রাস্তায় যে দুটো একটা লোক চলছিল তারা থমকে দাঁড়ায়, পাশের বাড়ির বারান্দা ও রকের ওপর, যেন নতুন করে সেজেগুজে তিন চারটা মেয়ে এইমাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, খিলখিল হেসে উঠল। 'যা, ভিতরে যা, মদ গিলে একেবারে পিপে হয়ে আছে।' 'এই পুলিসম্যান!' যেন স্বপ্ন দেখছে বাবলু, বাবার ডাক শোনা মাত্র সেই পুলিসটা পাশের কোনো গলি থেকে বেরিয়ে এসে মেয়েটাকে ধরতে এল। এখন শাড়িটাও আর পরনে নেই। কেবল শাদা

ফুটকি তোলা একটা গোলাপী সায়া, আলুথালু চুল, আর ওর চোখ, —সে যে কি অদ্ভুত চাউনি। বাবলু ভয় পেল। ভয় পেল আবার তার কেমন কান্নাও পেল। কেননা সকলের বাধা চিৎকার উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত একটা কাগজের ঠোঙ্গা হাত বাড়িয়ে বাবলুর কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিতে পেরে মেয়েটা হা-হা শব্দ করে হাসতে লাগল: 'মাণিক, আমার সোনার চাঁদ, সেই কখন থেকে আমি এগুলো নিয়ে বসে আছি, ওপর থেকে দেখতে পেয়েই তো ছুটে এলাম।' ওর হাসি দেখে অন্য মেয়েগুলোও শব্দ করে হাসল।

পাশের বাড়ি এবং দোতলা বাড়ির রকে বারান্দায় আবার একটি দুটি কবে মেয়ে এসে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। 'মানুর আবার বিয়ে দিয়ে দে তোরা, নতুন করে ঘর-সংসার পাতুক, বাচ্চাকাচ্চা দেখলে যখন ও এমন—' ওদের বাকি কথাগুলো শুনতে পেল না বাবলু। ঠুংঠুং শব্দ করে রিক্সা ছুটতে আরম্ভ করে। আর এক ফোঁটা জল তার নাকের ডগায় পড়তে সে ওপরের দিকে তাকায়। কিন্তু অন্ধকার আকাশে কি পরিমাণ মেঘ জমা হয়েছে বুঝতে পারে না। চোখ নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে। একবার, একবার মাত্র কাগজের ঠোঙ্গাটা সে খুলতে গেছে, কিন্তু বাবা এমন জোরে ধমক দেয় যে বাবলু আর সাহস পায় না। 'বাড়ি গিয়ে, রাস্তায় কিছু খেতে নেই।' হয়তো ধমকটা বাবা একটু বেশি জোরে দিল বলে বাবলু সারা রাস্তা একটা কথাও মুখ দিয়ে বার করতে সাহস পেল না। এমন কি সেই জরুরি কথাটা, মার ইঞ্জেকশন কেনা হয়েছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করা হল না। হয়তো কিনেছে, এই জন্যই তো বাবা বেরিয়েছিল। কাল সকালে ডাক্তার এসে মাকে ইঞ্জেকশন দেবে। বাবলু এভাবে মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করল এবং তাতে সে কিছুটা শান্তি পেল। তারপর অন্য কথা অন্য ঘটনাগুলো, সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে রিক্সায় ওঠা পর্যন্ত যা

যা সে দেখল শুনল, মাথার মধ্যে এসে ভিড় করতে আরম্ভ করল। এতটুকুন মাথা। জায়গা কম। সেই তুলনায় ঘটনাগুলো বেশি এবং সেগুলোর চেহারা ছবিও অন্য রকম, তার প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে একেবারেই মিলছিল না। তাই সবগুলো কেমন যেন মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে তাকে আরো বেশি বোকা বোবা করে দিল। বাবার পাশে বসে সে সেই গন্ধটাও খুব বেশি পেতে লাগল। অবশ্য সেটা সম্পর্কে সে আগেই নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে। অন্য জিনিস অন্য কিছু খেয়েছে, না হলে মোটা মেয়েটার মতন বাবাও তো কাঁদত হাসত আজেবাজে হাজারটা কথা বলত। আর সেই তুলনায় বাবা কত স্থির কত গম্ভীর কত শক্ত।

'অন্য কিছু অন্য জিনিস।' রিক্সার ঠুংঠুং আওয়াজের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ছড়াকাটার মতন মনে মনে বলল সে আর আড়চোখে চুরি করে করে বাবাকে দেখল। দেখে আরো বেশি নিশ্চিন্ত হ'ল। কিন্তু সবচেয়ে সে বেশি খুশি বাড়ি ফিরে মাকে দেখে। শাদা ছোট্ট শুকনো মুখ হা করে মা অকাতরে ঘুমোচ্ছে। অন্য দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে কী ছটফটানি। বাবা ওষুধ নিয়ে আসবে, বাবা তার ওষুধ কিনতে গেছে এই সুখে মার এমন নিটোল সুন্দর ঘুম। বাবলু ভাবল। 'খাবি না মানে, দু'টো খেয়ে নে।' ক্ষুধাটা কেমন গুলিয়ে গিয়ে পেটটা গুরগুর করছিল বলে বাবলুর খেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু বাবাব ধমক খেয়ে সে আপত্তি করল না। বরং খুশি হয়ে ভাত খেতে বসল। বাবা কতদিন পর রাত্রে তাকে পাশে বসে খেতে বলছে। 'মা ওঠ, একবার জেগে গ্যাখো।' বলল সে মনে মনে, মাকে ডাকল না যদিও। খেয়ে উঠেই চুপ করে বিছানায় চলে গেল।

না, অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার চোখে ঘুম এল না। মশারির অন্ধকার চাঁদোয়াটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে কিছু সময় তাকিয়ে

থেকে পরে চুপিচুপি ও বালিশের তলা থেকে কাগজের ঠোঙ্গাটা বার করল। বার করে সবগুলো চকলেট বুকের ওপর রেখে গুনল। বারোটা। মোড়ক ছাড়িয়ে একটা মুখে পুরল। বাবলুর এখন ভীষণ মনে পড়ল মাতাল মেয়েটাকে। 'না না, সবকটা মেয়ের চেয়ে ঐ মেয়েটা ভাল। মদ খেয়ে সকলের বকুনি খেয়েও আমাকে আদর করতে এসেছিল, আমাকে চকলেট দিলে। আমার মত ওর একটি ছেলে ছিল বুঝি—কোথায় গেছে ছেলেটা, মবে গেছে? তাই তো ওব এত দুঃখ।' ভেবে বাবলুর চোখের পাতা ভিজে উঠল, ভারি হয়ে গেল। ভারি হয়ে একটু একটু কবে ঘুম আসতে লাগল। ঘুমেব মধ্যেই ও চকলেট চুষছে কি। চকলেট চোষার কেমন একটা অদ্ভুত শব্দে তার চোখের পাতা দু'টো হঠাৎ খুলে যায়। বাবলু কিছুটা অবাক হয়ে অন্ধকার চাঁদোয়াটার দিকে আবার তাকিয়ে থাকে। এই শব্দ, ঠিক এমন একটা শব্দ সে অমলের পড়ার ঘবে বসে শুনেছিল না? আর সঙ্গে সঙ্গে অমলের মার গলাঃ 'ছিঃ, ছেলেরা রয়েছে ঘরে।' কথাটা মনে পড়ে বাবলুর কপালটা ঘামতে লাগল। তারপর কি ভেবে ও আস্তে আস্তে বালিশ থেকে মাথাটা তুলে ধরল, কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না, তাই সোজা হয়ে বসে কান খাড়া করে রাখল। অমলদের মতন পার্টিশান নেই, তার কামরা আব বাবা-মার কামরার মাঝখানে একটা পর্দা ঝুলছে। কিন্তু কোন শব্দ শুনল না বাবলু পাশের ঘবে। মা অসুখে ভুগে এত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে যে, ঘুমোলে নিশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যায় না, যেন মরে থাকে। বাবা এমনি গম্ভীর, তার ওপর যখন ঘুমোয়, মনে হয় পাথরের মতন জমাট বেঁধে গেছে, যেন আরো শক্ত কঠিন তখন। অসহায় চোখে বাবলু ধূসর পর্দাটা দেখতে থাকে। তারপর সে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে হাত দু'টো বুকের ওপর জড়ো করে ধরে রেখে ঈশ্বরকে ডাকল, 'ঈশ্বর, আমলের বাবা মাব মতন আমাব বাবা মার মধ্যে মিল করে দাও।' ডাকতে ডাকতে সেই অবস্থায় একসময় সত্যি ও ঘুমিয়ে পড়ল।

গিরগিটি

সস্তা টিনের ঘর হলেও বাড়িটা তার ভাল লাগে। লোকজন একরকম নেই বললেই চলে। মোটে আর এক ঘর ভাড়াটে। তা-ও ঠিক পাশাপাশি ঘর না। উঠোন পার হয়ে বাঁ দিকের ভাঙ্গা জিরজিরে একটা দেওয়াল ঘেঁযে ডুমুর আর পেঁপে জঙ্গলের আড়াল করা নিচু একচালার একটা খুপরী নিয়ে বুড়ো মানুষটা ওধারে পড়ে আছে। ওর থাকা না থাকা সমান কথা। সারাদিনের মধ্যে এক আধবার যদি কাশির শব্দ কি যন্ত্রপাতি চালাবার টুংটাং আওয়াজ কানে আসে,—আসে না। ডুমুর গাছ পেঁপে জঙ্গল ভাঙ্গা নড়বড়ে পাঁচিল সামনে নিয়ে ঐটুকুন ডেরার জং-ধরা পুরোনো টিনের দরজার আড়ালে বসে দিনরাত বুড়ো ভুবন সরকার কি করে দেখবার তিলমাত্র কৌতূহল বা ইচ্ছাও অবশ্য তার হয় না। বরং যদি কেউ এখন মায়ার ঘরে উঁকি দেয় তো দেখতে পাবে দেওয়ালে টাঙ্গানো একটা বড় আরশীর সামনে দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে ও নিজেকে দেখছে। দেখছে আর যেন আনন্দের আতিশয্যে মৃদু শিস দেওয়ার মতন একটা গানের সুর জিহ্বা ও ঠোঁটের মাথায় জড়িয়ে রেখে রেখে তারপর একসময় নিজের নিশ্বাসের সঙ্গে বার করে সেটা ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গায়ের জামায় বোতাম নেই, আঁচলটা ঢিলে হয় মাটিতে লুটোয়, খোঁপার বাঁধন খুলে দেওয়াতে ঘাড়ে পিঠে কোমর অবধি একরাশ কালো চুল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মাঝারো গড়ন। রং খুব ফর্শা না। কিন্তু মুখখানা সুন্দর। অন্তত মায়ার নিজের কাছে নিজের ছোট্ট পাতলা কপাল আর তু'ধারে একটু বেঁকে যাওয়া না-সুরু-না-মোটা ভুরু ও ঢালুর দিকে ঈষৎ ছড়িয়ে পড়া নাক ও কালো পালক ঘেরা চোখের লালচে মতন বা বলা যায় বাদামী রঙের চকচকে

মণি দু'টো অসম্ভব ভাল লাগে। হ্যাঁ আর ওর কচি পেয়ারার মতন ছোট্ট সুগোল মসৃণ একখানা থুঁতনি। নিজের কাছে তো বটেই প্রণবের কাছেও এই চোখ এই নাক এই ভুরু গাল কপাল এবং বিশেষ করে শক্ত পালিশ গোল ছোট্ট থুঁতনিটা যে কত প্রিয় তা মায়া এই দু'বছরে বেশ বুঝে নিয়েছে। বাপ্, আদর করতে সকলের আগে প্রণব এই থুঁতনি ধরে নাড়া দেবে টিপবে রগড়াবে নয়তো থুঁতনির ওপর নিজের নাক কি গালটা চেপে ধরে ঘষবে। খসখসে গালের ঘসায় মায়ার থুঁতনির ছাল উঠে যায় যেন। কিন্তু তা কি আর কোনদিন গেছে। দু'বছর আগে কুমারী বয়সে যেমন ছিল আজও সেই থুঁতনি নিটোল অক্ষত হয়ে নিজের জায়গায় চুপ ক'রে বসে আছে। যেন এর ক্ষয় নেই বৃদ্ধি নেই জরা নেই। কচি পেয়ারা। তুলনাটা মনে করে মায়া হাসল। অথচ দু'দুটো বর্ষায় না জানি কত সহস্র গাছের পেয়ারা বড় হ'ল পাকল কি পাকবার আগেই পোকা কি বাদুড়ের কামড়ে নষ্ট হয়ে নিচে ঝরে পড়ল। আনন্দের আতিশয্যে মায়া বাঁ হাতের দু'টো আঙুল দিয়ে নিজের সুন্দর থুঁতনিটা একবার স্পর্শ করল। তারপর আরশীর কাছ থেকে সরে এসে এধারের দেওয়ালের ব্র্যাকেটে কুঁচিয়ে রাখা খয়েরী পাড় বুটিদার শাড়ি আটপৌরে একটা ব্লাউস ও শুক্‌নো তোয়ালেটা টেনে নামাল। সাবানের কেস্ ও দাঁতন নিতে ভুলল না। কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে তখনি কি ও কূয়োতলায় গেল ? না। এ-বাড়ির সুবিধা এই। কানে শুনতে খারাপ লাগে যে কল নেই। কিন্তু তাতে কি। দু'জন তো ওরা মানুষ। অফিসে যাবার আগে রাস্তার কল থেকে প্রণব দু'বালতি জল ধরে নিয়ে আসে। তাতেই তাদের রান্না আর খাওয়া কুলিয়ে যায়। বিকেলে এক আধ বালতি আনতে হয়। তা-ও রোজ না। কোনো কোনো দিন। এদিকে স্নান হাত-মুখ ধোওয়া বাসনকোসন ধোওয়া কাপড় কাচাকাচি সব, সব পাতকূয়োর জলে।

কত সুবিধা। সারাদিন বালতি ডুবিয়ে ডুবিয়ে যত খুশি জল টেনে তোল কেউ কিছু বলবার নেই। তা ছাড়া ঘড়ি ধরা সময় নিয়ে কলে জল এলো কি চলে যাচ্ছে বলে যে তাড়াহুড়ো করে কাজ সারতে হয় না এটাই মায়ার সবচেয়ে ভাল লাগে। প্রচুর সময় নিয়ে আলসেমীর নৌকোয় গা ভাসিয়ে দিয়ে এক এক সময় এক একটা কাজে হাত লাগালেই হ'ল। আর বড় কথা ভিড় বলতে কিছু নেই এখানে। মায়া ছাড়া আর কারোর কুয়ো-তলায় কাজ আছে বলেও মনে হয় না। প্রণব সেই সাত সকালে দু'বালতি জল মাথায় ঢেলে খেয়ে অফিসে বেরিয়ে যায়। ফেরে বিকেল পাঁচটায়। আর কে? ওপাশের ঘরের বুড়ো? লোকটাকে মায়া কোনোদিন কুয়োতলায় দেখল না। ও আসলে স্নান করে কিনা খায় কিনা মায়ার সে সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। খায় নিশ্চয়ই। না হলে আর বেঁচে আছে কি করে। কিন্তু রান্না করে কি? তা হলে তো অন্তত এক আধ বালতি কুয়ো থেকে কি কল থেকে হোক,—আব রান্না না করলেও এমনি তো জল খেতে হয়—সেইটাই বা কোথা থেকে আসে। রাত ন'টায় আর একবার বাস্তার কলে জল আসে। যদি তখন? কিন্তু তা-ও মায়ার চোখে পড়েনি। অবশ্য মাঝে-মাঝে রাত বারোটায়ও জল আসে। তখন কি? তা অবশ্য মায়া বলতে পারে না। বা বাস্তার কল থেকে এত বাত্রে জল ধবে তার ঘরের সামনে দিয়ে কেউ যাচ্ছে কি না দুপুব রাত অবধি জেগে বসে থেকে লক্ষ্য করার মায়াব ইচ্ছা ধৈর্য কোনটাই নেই। বড় কথা এখানে এ-বাড়ির উঠোন যেমন ফাঁকা তেমনি কুয়োতলাটাও সারাক্ষণ ফাঁকা থাকে বলে মায়ার যখন ইচ্ছা তখন যতটা খুশি সময় নিয়ে কাজ করার সুবিধা আছে। এই চেয়েছিল ও এমনটি সে চাইছে। শাড়ি সায়া ব্লাউস এক হাতে আর এক হাতে দাঁতন সাবানের বাক্স নিয়ে ও উঠোনে ডান পাশের নিম

গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল। এখন বর্ষা ঋতু। পাতা ও ফলে ফলে গাছটা বোঝাই হয়ে আছে। দু'টো একটা নিম ফল পাকছে। একটা দু'টো মাটিতে পড়ছে। আর পাকা নিম ফলের লোভে রাজ্যের বুলবুলি উড়ে এসে কিচিরমিচির করছে উড়ছে ছুটোছুটি করছে ডাল থেকে ডালে। মায়া ওর সুন্দর থুঁতনি তুলে ওপরের দিকে তাকিয়ে পাখিদের নিমফল খাওয়া দেখল। নির্জন কুয়োতলার মতন নিমগাছটাও এ-বাড়ির একটা সম্পদ, অন্তত মায়ার কাছে, ভাবে ও। অবশ্য বাড়িওয়ালা বরদাসুন্দর বটব্যাল জল্পনা করছে, এপাশের নিমগাছ ওপাশের ডুমুর আর পেঁপের জঙ্গল সাফ করে ফাঁকা উঠোনের সবটা জুড়ে বড় দোতলা পাকা দালান তুলবে। টিনের ঘর রাখবে না। কিন্তু সেটা কবে হবে আজকালই হচ্ছে কিনা শোনা যায় নি। অবশ্য তাই নিয়ে মায়া কি তার স্বামী প্রণব মাথা ঘামায় না। টিনের ঘর ভেঙ্গে দিলে সস্তা ঘর খুঁজতে তারা কোনদিকে যাবে, না কি এখানেই দোতলার পাকা ঘরে একটু 'সুবিধামতন' ভাড়া হলে থেকে যাবে তা-ও তারা কিছু ঠিক করেনি। বরং সেসব না ভেবে মায়া সবুজ চকচকে চিকবিকাটা নিমপাতাগুলোর নাচানাচি দেখতে লাগল। আকাশের থমথমে মেঘলা ভাব কেটে গিয়ে একটু সময়ের জন্য রোদ উঠতে পাতাগুলো যেন হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে একটাল ইঁট কবে থেকে পড়ে আছে। মখমলের মতন পুরু নরম সবুজ শ্যাওলার একটা আস্তরণ সবগুলো ইঁটকে যেন জমিয়ে এক ক'রে দিয়েছে। আগুনে রঙের দু'টো ফড়িং সবুজ ইঁটের পাঁজা ঘিরে নাচানাচি করছে। ওপাশের ডুমুরের ডালে এতবড় একটা গিরগিটি স্থিরচোখে তাকিয়ে ফড়িং দুটোকে দেখছে। যেন কোথাও একবার একটু শান্ত হয়ে ওরা বসলে সে লাফিয়ে পড়ে ওদের ঘাড় কামড়ে ধরবে। করুণ চোখে ফড়িং দুটোকে আর একবার দেখে মায়া আস্তে আস্তে কুয়োতলার দিকে চলল।

কুয়োতলার এখানে ওখানে লম্বা ঘাস গজিয়েছে। জায়গাটা সিমেণ্ট করা নেই। গোড়ার দিকে মায়ার অসুবিধা হ'ত। জল কাদা আর আগাছার জঙ্গলে দাঁড়িয়ে দড়ি বাঁধা বালতি নামিয়ে কুয়ো থেকে জল টেনে তুলতে ওর এমন গা ঘিনঘিন করত। কিন্তু আশ্চর্য, ক'দিনে এটা সয়ে গেছে। প্রণব খান ছয়েক পুরোনো ইঁট বিছিয়ে দেওয়ার পর থেকে মায়া আর কোনো অসুবিধাই বোধ করে না। বরং কুয়োতলার এই মাটি, লম্বা ঘাস, ঘাসের ফাঁকের চিকচিকে জল কাদা আর অগুণতি কিলকিলে মশার বাচ্চা দেখতে ওর এখন ভাল লাগে। যেন এগুলো না থাকলে খারাপ লাগত। বিয়ের পর থেকে এতকাল ওরা শহরের মাঝখানে যে বাড়িতে ছিল সেখানে সিমেণ্ট করা শক্ত ঠনঠনে কলতলার বাঁধানো চৌবাচ্চার পাশে ব'সে একদঙ্গল মেয়েছেলের কাপড় কাচাকাচি কলরব আর তাড়াহুড়োর চাপে পড়ে মায়ার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। মাটি আকাশ ঘাস পোকার গন্ধ ছিল না। ছিল দেওয়াল আর কটকটে ফিনাইলের গন্ধ আর সস্তা সাবান হেয়ার-অয়েলের মিঠে পচা গন্ধে ভরা বদ্ধ বাতাসের গুমোট। কলতলায় যতক্ষণ থাকত মায়ার গা-বমি করত। এখানে খোলা হাওয়া আর ঘাসের শিসের দোলানি আর নিমগাছ থেকে ভেসে আসা পাকা নিমফলের গন্ধ আর বুল-বুলির কিচিরমিচিরের এক আশ্চর্য নির্জন জগতে হাত পা ছড়িয়ে বসে মায়া যতক্ষণ খুশি প্রণবের কিনে দেওয়া ভাল সাবনটা মাখতে পারে —যেভাবে খুশি। বাপস্, আগের বাড়িতে ইচ্ছামতন খোলা গা হয়ে বসে মায়া একদিন সাবান মাখতে পারেনি। হ্যাঁ, মেয়েরাই,— একটি মেয়েরা গায়ের কাপড় সরে গেলে কি খুলে ফেললে এমন সন্দিগ্ধ কুটিল চোখে তাকায়! আর চোখ টেপাটেপি ঠোঁট টেপা-টেপি। এখানে সে সব বালাই নেই। মায়া এক টানে গায়ের ব্লাউসটা খুলে ফেলল। কাঁচুলি ও সায়ার বাঁধন আলগা করে দিতে সরসর করে সেগুলো আপনা থেকে খসে পড়ল। পা দিয়ে এক

পাশে ও-ছুটো ঠেলে সরিয়ে রাখল ও। এমনি জল দিয়ে কেচে দেবার ইচ্ছা। এখন শুধু পেঁয়াজের খোসার মতন পাতলা শাড়িটা ওর গায়ে পতপত করছিল। এলোমেলো হাওয়া। হাওয়ার ঝাপ্‌টায় শাড়িটা একসময় গায়ের চামড়ার সঙ্গে লেপ্টে যেতে হাড় ও মাংসের স্থূল সূক্ষ্ম বাঁকা ও আধ্‌-বাঁকা রেখাগুলো একসঙ্গে জেগে উঠল। এ এক আশ্চর্য অনুভূতি। গায়ে জল ঢালার আগে রোজ ও কিছুক্ষণ এমনি দাঁড়িয়ে থেকে শাড়ির পতপত ও হাওয়ার শির-শিরানিটা অনুভব করে। যেন প্রত্যেকটা রোমকূপের মধ্যে হাওয়া ঢুকে গলা বুক পিঠ পেট কোমর তলপেট উরু হাঁটু হাঁটুর নিচে পায়ের মাংসল ডিম ছু'টোকে সতেজ স্নিগ্ধ ক'রে দেয়। আঁচলটা আর গায়ে রাখে না ও। কোমরে জড়ায়। তারপর কুয়োপাড়ের উঁচু সিমেণ্টের ওপর কনুইয়ের ভর রেখে কোমর থেকে থুঁতনি পর্যন্ত সবটা শরীর সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে নিচের অন্ধকার জলের দিকে তাকায়। জলের আয়নায় নতুন করে সে নিজেকে দেখে। যেন চিনতে পারা যায় না এ-মায়া সেই মায়া এই কপাল সেই কপাল, এই থুঁতনি সেই থুঁতনি, এ বুক সেই বুক। কি, ঘরের আরশীতে এইমাত্র সে দেখে এসেছে ছু'টো পাকা বেলের মতন কেমন সুন্দর শক্ত জমাট ওর স্তন আর এখানে জলের অন্ধকারে কেমন যেন বিশ্রী হয়ে ঝুলে পড়েছে। এ-অবস্থা দেখে মায়া প্রথমটায় চমকে ওঠে, ভয় পায়। তারপর অবশ্য কারণটা বুঝতে পেরে নিজের মনে ও হাসে। সামনের দিকে অতটা ঝুঁকে থাকলে বুকের ঐ চেহারা দাঁড়াবেই। সুতরাং ভয় মিছে। আসলে ওর—চট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকের ওপর চোখ রেখে সে নিশ্চিন্ত হয়। তেমনি নিটোল মসৃণ জোড়া ফলের স্বপ্ন হয়ে ছুটো স্তন তাকিয়ে আছে স্থির চোখে। তামাটে বোঁটা ছু'টোকে মায়ার কেন জানি ভীষণ চোখ চোখ মনে হয়। তাকিয়ে থাকে। কার দিকে তাকিয়ে আছে ওরা সারাক্ষণ?

কি দেখছে? মায়া আবার নিজের মনে একটুখানি হাসল। আবার জোরে হাওয়া বইছিল আর ওর সারা শরীর শিরশির করছিল এমন সময়, হঠাৎ, ও চমকে উঠল। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে কে হেঁটে এল না। ব্যস্ত হয়ে আঁচলের খুঁটটা কোমর থেকে টেনে খুলে তাই দিয়ে ও কোনরকমে বুক ঢেকে তারপর ঘাড় ফেরাল। ঘাড় ফিরিয়ে মানুষটার চেহারা দেখে মায়া নিশ্চিন্ত হয়। ভয় পাওয়ার কিছু না। একটা হাঁড়ি হাতে করে ভুবন সরকার অদূরে পেয়ারা চারাটার গুঁড়ি ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। যেন জল নিতে এসে কুয়োতলায় স্ত্রীলোক দেখে বুড়ো লজ্জা পেয়ে আর পা বাড়াচ্ছে না। মায়া কিন্তু ততটা লজ্জাবোধ করল না। কোনদিনই করে না। পাঁকাটির মত সরু জিরজিরে হাত-পা, শুকনো খটখটে ক'খানা পাঁজর, শনের মত পাকা একমাথা লম্বা রুক্ষ চুল ও হলদে ফ্যাকাশে চোখ জোড়া নিয়ে কালেভদ্রে যদি কখনও লোকটা তার সামনে এসে দাঁড়ায় কি পাশ কেটে চলে যায়, মায়ার মনেই হয় না একটা মানুষ, একজন পুরুষ। ঠিক বুড়ো হয়েছে বলে না, ওর ক্ষীণ হাত-পা নিষ্প্রাণ চাউনি, মন্থর চলার মধ্যে এমন একটা কিছু মিশে আছে যে, মায়ার কখনও কখনও ওকে দেখলে ডুমুরতলার ওধারের পুরোনো ভাঙ্গা পাঁচিলটা কি পেঁপে-জঙ্গলের পাশের মৃত নিষ্প্রাণ সহস্র ক্ষতচিহ্নযুক্ত মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ে। এর বেশি না। অথচ এ-ও যে বরদাসুন্দর বটব্যালের সাড়ে বারো টাকা ভাড়ার টিনের ঘরের ভুবন সরকার নামধেয় একজন মান্য-গণ্য বাসিন্দা এবং একজন ইলেকট্রিক মিস্ত্রী মায়া ভুলে যায়।

একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়ে মায়া অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু ভুবন জল নিতে অগ্রসর হচ্ছে না। যেন সাহস পাচ্ছে না। 'নিন, আপনি জল নিয়ে যান।' মায়া ডাকল।

মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল ভুবন। ডাক শুনে চোখ তুলল।

'আপনি চান সেরে নিন। আমার পরে হলেও চলবে।' কথা

বলল না লোকটা। যেন পোকায়টা একখাওয়া শুকনো ডুমুর-পাতা খসখস শব্দ করে উঠল।

'আমার চান সারতে দেরি হবে।' কথাটা বুড়োকে বুঝিয়ে বলা দরকার, না হলে বুঝবে না টের পেয়ে মায়া রাগ না করে বরং শব্দ করে হাসল। 'আপনাকে ওখানে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার চান করা চলবে কি ?'

হাঁ করে তাকিয়ে ভুবন তার একমাত্র প্রতিবেশিনীর হাসি দেখছিল। না কি কচি সবুজ চিকরিকাটা নিমপাতার গায়ে বর্ষা দুপুরের রৌদের ঝিলিক দেখছে বুড়ো, ভাবল মায়া। তার ঠোঁটে চোখে সত্যি তখন মেঘ-ভাঙ্গা এক আঁজলা হলুদ রোদ ঝিলমিল করছিল।

পেয়ারা পাতার ছায়ায় দাড়িয়ে শুকনো কাঠের মত মানুষটা যেন আরো কালো হয়ে উঠল।

'না, আপনার চান সারা হোক। আমি ঘুরে আসছি, হাতের একটু কাজও বাকি আছে বটে।' বলে বুড়ো আর দাঁড়ায় না, সরে যায়। কষ্ট লাগে মায়ার। হয়তো এভাবে বলা ঠিক হয়নি। যদি দাঁড়িয়ে থাকত ওখানে তো দোষ ছিল কি। তা ছাড়া জল নিতেও বড় একটা আসে কই। নিশ্চয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল এখন। গায়ে জল ঢালার আগে বুকের আঁচলটা আবার কোমরে জড়াতে জড়াতে মায়া ভাবে। এ বাড়ির ভাঙ্গা পাঁচিল মরা গাছ কি ছাতা-পড়া পুরোনো ইঁটের পাঁজার সঙ্গে যে লোকটার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়ে মায়া পরিতৃপ্ত ছিল আজ তাকে হঠাৎ আলাদা করে দেখতে যাওয়া কি তার পায়ের শব্দে গা ঢেকে ফেলার মধ্যে কি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেল না ? মায়ার বুকের মধ্যে কেমন খচখচ করতে লাগল। এক টুকরো অনুশোচনা গলার কাছে আটকে থেকে যেন জায়গাটা জ্বালা জ্বালা করে উঠল। স্নান করার আনন্দ তেমন ক'রে ও অনুভব করতে পারল কই। সাবান-গোলা জল দুধের ধারা হয়ে ওর উষ্ণ

কোমল ঝকঝকে চামড়ার ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। একলা মায়া ছাড়া পৃথিবীর আর কেউ তা দেখছে বলে আজ আর সে মনে করতে পারল না। অথচ ওরা রোজ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখে, হ্যাঁ, সহস্র পাতার চোখ মেলে এ বাড়ির নিমগাছ, রোদ কি জল ঠেকাতে বড় বড় ছাতা মাথায় ওধারের পেঁপে গাছগুলো, এপাশের কচি পেয়ারা গাছটা, ওদিকের পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো। ইঁটের পাঁজা ছেড়ে লাল ফড়িং দু'টো উড়ে এসে ঘুরে ঘুরে মায়ার ভিজে চুল দেখে নাভি দেখে স্তন দেখে জঙ্ঘা দেখে। কচি কলাপাতার বোঁটার মত ওর পিঠের ঋজু মসৃণ সুন্দর শিরদাঁড়া ঘেঁষে একটা মশা হুল ফুটিয়ে দিয়ে এতটা রক্ত খেয়ে পেট মোটা করে একসময় উঠে গেল। যেন মায়া টের পেল না। ভাল করে তোয়ালে দিয়ে গা রগড়াতে আজ তার হাত উঠছিল না। ভাবছিল ও মানুষটাকে এখানে দাঁড়াতে নিষেধ করা আর ডুমুরের মরা ডাল-টাকে এদিকে উঁকি দিতে বারণ করা এক কথা। যেন সেই অভিমানে ফড়িং দু'টো এল না, পাঁচিলের মাথায় কাকগুলো নেই, পেঁপে গাছগুলো ছাতার আড়ালে মুখ ঢেকেছে, নিমগাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে ব্যস্ত। মায়ার স্নান দেখতে কারো উৎসাহ নেই। ওদের একজনকে সরে দাঁড়াতে বলায় বাকি সবাই রাগ করেছে দুঃখ পেয়েছে। অথচ এদের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরা খুলে দেওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে পাঁচ বালতির জায়গায় পনেরো বালতি জল ঢেলেছে ও, প্রণবের কিনে দেওয়া সাবানটাকে বার বার ঘসে কদিনে ক্ষয় করে এনেছে।

মৃদু একটা আঘাত বুকে নিয়ে কোনোরকমে ও স্নান শেষ করল। ভাল করে মাথা মোছা হ'ল না তোয়ালে বা কাপড়ের জল নিংড়ানো হ'ল না। মন্থর ভারি পায়ে কুয়োতলা ছেড়ে ও ঘরে ফিরে এল। তখনি আবার তার আরশীর সামনে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু তা সে করল না। ভেজা কাপড়গুলো মেলে না দিয়ে দলা করে সেভাবেই

দরজার পাল্লার ওপর রেখে দিল। টস্‌টস্‌ করে জল ঝরছিল সে-গুলো থেকে। মায়া এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে তা দেখল কিন্তু সে-সম্পর্কে ও কিছু ভাবছে বলে চোখ দেখে মনে হ'ল না। চৌকাঠ পার হয়ে আস্তে আস্তে ও আবার উঠোনে নামল। আবার এক সেকেণ্ড কি ভাবল, তারপর ওপাশের ডুমুর জঙ্গল ও ভাঙ্গা পাঁচিলটার দিকে তাকিয়ে ডেকে বলল, 'আমার হয়ে গেছে, আপনি যান।'

কেউ সাড়া দিল না। টিনের ডেরা থেকে বেরোলো না কেউ। মায়া আর একটু সময় অপেক্ষা করল। একটা শালিক ওর পায়ের শব্দে উঠোনের ঘাস ছেড়ে উড়ে পেয়ারার ডালে গিয়ে বসল। এক পা এক পা করে মায়া ডুমুরতলার দিকে এগোয়।

টিনের চাল প্রায় মাথায় ঠেকে। ভিতরে ঢুকল না ও। চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি দিয়ে দেখল। অবাক হ'ল না, বরং মায়ার দুঃখ হ'ল। মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হাতের কাছে মাটিতে দু'টো একটা যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। কোনোটা জং ধরা। কোনোটার হাতল নেই, কি মাথা ভেঙ্গে গেছে। ওধারে দু'টো গোল মতন কি যেন পড়ে আছে। ইলেকট্রিকের কলকব্জা কিছু হবে মায়া অনুমান করল। পাশেই আর একটা জিনিস দেখে মায়া চিনল। টেবিলফ্যান্‌। দু'টো ব্লেডই ভেঙ্গে গেছে, একটা আছে। ওটা ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ না হয়ে যায় না। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে সব দেখা শেষ করে মায়া আবার বুড়োর মুখটা দেখতে লাগল। দু'টো চোখ গর্তে ঢুকে পড়েছে। কপালের চামড়া ঠেলে পাকানো দড়ির মতন একটা মোটা শিরা বেরিয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন দু'টো চোয়াল। নাকটা উঁচু, গাল কপাল শুকিয়ে যাওয়ার দরুন আরো বেশি উঁচু দেখাচ্ছে। গলায় বুকে ক'খানা শুকনো হাড় ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। শিয়রের কাছে শূন্য এল্যুমিনিয়মের ডেকচিটা পড়ে আছে। দেখে মায়ার দু'চোখ আবার ছলছল করে

উঠল। একটু সময় ইতস্তত করে তারপর ও আস্তে ডাকল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন কি? ঘুমোচ্ছেন?'

'হুঁ হুঁ কে?' বুড়ো চমকে উঠে চোখ মেলে দরজার দিকে তাকাল তারপর ব্যস্ত হয়ে পা দুটো গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল। হাত দিয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে অল্প হাসল, হাই তুলল একটা। 'ভাবলাম আপনার চানটা হোক হাতের কাজটা সেরে ফেলি, আর এর মধ্যে কিনা চোখটা লেগে গেল।'

'আমার হয়ে গেছে, যান।' বলল মায়া, বলে চলে আসত চৌকাঠ ছেড়ে, কিন্তু পারল না, দাঁড়িয়ে রইল। এই প্রথম ওর মুখোমুখি দাঁড়ানো। শুকনো মরা গাছ দেখে যেমন ভয় বা লজ্জা পাওয়ার প্রশ্ন মনে জাগে না এখানেও তাই। শূন্য হাঁড়িটা তুলে নিয়ে মায়ার সামনে দাঁড়িয়ে ভুবন ওর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে যেন কি বলি বলি করছে। মায়া মাটির দিকে চোখ নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'এইবেলা বুঝি রান্না বান্না হবে?' কোণার দিকে একটা উনুন ও কিছু ভাঙ্গা বাঁশ কাঠের টুকরো মায়ার চোখে পড়েছে।

'হুঁ দিদি, ইচ্ছা ছিল সেরকম, তা শরীরটা যেন এখন আর নড়াতে ভাল লাগছে না।' বলে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল ভুবন, চুপ করে রইল একবার, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'বেলা এখন ক'টা ঠিক বাজবে দিদি?'

'বারোটা হবে।' মায়া মাটি থেকে চোখ তুলল। 'অনেক বেলা হয়েছে।' যেন মানুষটার চোখের রং এখন আর তেমন ফ্যাকাশে না থেকে একটু চকচকে হয়েছে দেখে মায়া ঘাড় ফিরিয়ে বাইরে ডুমুর পাতার ফাঁক দিয়ে আকাশের রোদ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হ'ল। শুকনো পাতার খসখস শব্দের মত নিশ্বাসের আর একটা শব্দ কানে এল ওর।

'আহা, কত ভাল লোকের সংসর্গে আছি আমি।' যেন নিজের

সঙ্গে কথা বলছিল বুড়ো। 'দিদি আমার কষ্ট করে খবর দিতে এল কুয়োতলা অবসর হয়েছে, তুমি যাও।'

মায়া কথা বলল না। চোখের একটা প্রসন্ন ভাব নিয়ে বুড়োর শূন্য হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল শুধু। যেন বুড়ো আবার একটা কি বলি বলি করছিল। টের পেয়েও মায়া চোখ তুলল না দুটো লাল ফড়িং-এর একটা ইঁটের পাঁজা ছেড়ে এখানে উড়ে এসে ওর হাঁটুর কাছে ঘুরঘুর করছে দেখে মায়া অবাক হয় খুশি হয়।

'ইচ্ছে করেছে অনেকদিন, সাহস হয়নি কথা বলতে, কিন্তু দিদি যে এত ভাল মানুষ আমি কি জানতাম।' ভাঙ্গা অসমান নোংরা দাঁত বার করে ভুবন অল্প শব্দ করে হাসল। 'কেমন ভাললোকের সংসর্গে বাস করছি আমি। আহা!'

'বুড়ো মানুষ আমার সঙ্গে কথা বলবেন তাতে—' বাকিটা বলল না মায়া সুন্দর পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝিয়ে দিল।

'বুঝতে পেরেছি বুঝতে পারি।' ভুবন খুশি হয়ে মাথা নাড়ল। 'সকল লোক কি আর সমান। সংসারে সব মানুষ একরকম হলে সৃষ্টি অচল হত।'

মায়া নীরব। ফড়িংটা এখন তার কানের কাছে খোঁপার পাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছিল।

'সকল লোক সমান না।' ভুবন আবার বলল, 'সেদিন রাস্তার কলে এই হাঁড়ি দিয়ে জল ধরতে গিয়ে কি কম নাকাল হতে হয়েছিল, দিদি, বড় বেশি অপমান হয়ে ফিরে এসেছিলাম।'

'কে অপমান করল?' মায়া বুড়োর চোখের দিকে তাকায়।

'দিদির বয়সী একটা মেয়ে, বৌ, কার বৌ জানি না, রাস্তার ওধারের একটা টালির ঘরে যেন থাকে।' বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তার বয়সের একটি বৌ বুড়োকে অপমান করেছে শুনে মায়ার দুঃখ এবং কৌতূহল হল। 'কি বললে বৌটা, কি বলছিল আপনাকে?'

'আমি হা করে দাঁড়িয়ে আছি। আমি হা করে দাঁড়িয়ে থেকে ওকে দেখছি। ওকে দেখতে আমার কলের কাছে দাঁড়ানো। জল ধরতে যাওয়াটা কিছু না, ছুতো।'

'ছি ছি ছি!' মায়া সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল। 'এমন একটা বুড়ো মানুষকে এভাবে বলতে কি ওর—'

বাকিটুকু বলল না মায়া। কিন্তু তার চোখের বেদনা ভুবনকে অভিভূত করল। 'সব মানুষ সমান না সকল চোখ এক না।' একটা ভারি নিশ্বাস ফেলে ভুবন মৌচাকের মতন মস্ত কালো খোঁপা ঘিরে লাল ফড়িং-এর নাচানাচি দেখল। গাল ঘুরিয়ে মায়া আবার একটু সময় পেয়ারা পাতার ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়া আষাঢ় আকাশের হলদে আলো দেখছিল।

'অনেক বেলা হ'ল, এইবেলা রান্নাবান্না আরম্ভ করুন।' ঘাড় ফিরিয়ে কথাটা বলতে গিয়ে মায়া চুপ ক'রে গেল। ফ্যাকাশে মরা চোখ দু'টোতে যেন অন্যরকম রং লেগে আবার চকচক করছে। ডান হাতের হাঁড়িটা বাঁ হাতে চালান দিয়ে ভুবন আস্তে আস্তে ঠোঁট নাড়ছে, যেন কি বলতে গিয়ে ইতস্তত করছে।

আর দাঁড়াল না, চৌকাঠ ছেড়ে মায়া উঠোনে নামল।

শুকনো ডুমুর পাতার খসখস শব্দ শুনে আর একবার ও ঘাড় না ফিরিয়ে পারে না। না, ভুল দেখেছে সে, মরা মাছের চোখ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বুড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। রুক্ষ জীর্ণ অস্থিসার একটি মানুষ। মৃত পত্রহীন মাদার গাছটার চেহারা মনে পড়ল মায়ার।

'আমায় কিছু বলছেন?'

'না', ভুবন মাথা নাড়ল। 'বলিনি কিছু। দিদিকে দেখে ভাবছিলাম। দিদিকে দেখলে আমার কেবলই ওই ডালিম চারাটার কথা মনে পড়ে।'

কোথায় ডালিম চারা, কোন্‌দিকে! যেন খুব বেশি চমকে

উঠল মায়া। আঙুল দিয়ে ভুবন উঠোনের একটা পাশ দেখিয়ে দিতে মায়া সেদিক তাকায়। অনেকদিন আগেই ওটা তার চোখে পড়েছে। কিন্তু এখন যেন নতুন ক'রে ও ডালিমচারাটা দেখতে পেল। চারা বলা চলে না ঠিক। গাছ। লম্বা ঋজু একটি মেয়ের সুন্দর দুটো বাহুলতার মতন সুগোল মসৃণ দুটো কাণ্ড আকাশের দিকে একটুখানি উঠে তারপর থেমে গেছে। তারপর কচি কচি ডাল। যেন অনেকগুলো আঙুল। আঙুল ছেয়ে নতুন লালচে সবুজ পাতার ঝিলিমিলি। হাওয়ায় দুলছে। যেন আঙুল নেড়ে নেড়ে মেয়েটি নিজের এলোমেলো চুলে বিলি কাটছে আব খিলখিল হাসছে। আর একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মায়া। আধফোটা একটা কলি সিঁদুরের রেখা হয়ে পাতাব মাঝখান থেকে উঁকি দিয়ে আবার তখনি লুকিয়ে যাচ্ছে। আব একটু মনোযোগ দিয়ে দেখল মায়া। একবার দেখল। দু'বার দেখল। বিস্ময়ে চোখের পলক পড়ছিল না। সুগোল সুঠাম আশ্চর্য সবুজ দুটো ফল। পাতার আড়াল সরিয়ে সন্তর্পণে দু'বার দেখিয়ে তারপর যেন লুকিয়ে ফেলল মেয়েটি আর খিলখিল হাসল। ছোট্ট একটা নিশ্বাস পড়ল মায়ার।

'চারা না, গাছ।' ঘাড় ঘুরিয়ে ও ভুবনের মুখেব দিকে তাকায়। ভুবন মাথা নাড়ল।

'নতুন গাছ। যৌবন লেগেছে গায়ে।'

মরা মাছের মত চোখ দু'টো আবার চকচক করছে কিনা দেখতে মায়া আর মুখ ফেরায় না। যেন কি ভাবছিল ও। ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে ফিরে এল।

কি, অপরের চোখে সে নিজেকে দেখছে? কে সেই পর? কেউ না। মানুষ না পুরুষ না। সংসারে একমাত্র পুরুষ প্রণব। তার স্বামী। যার মুখে রাতদিন তার রূপ যৌবন শরীরের অঢেল লাবণ্যের প্রশংসা শুনে শুনে মায়া এখন ক্লান্ত হয় বিরক্ত হয়। আর

কোনো পুরুষের চোখে মুখে সে তার বাইশ বছরের যৌবনের স্তুতি দেখল না শুনল না। যদি দেখত শুনত তবে কি সে রাগ করত? মায়া ঠিক ভেবে পেল না। বুঝতে পারছিল না ও। হাজার পাতার চোখ মেলে নিম গাছটা তার দিকে তাকিয়ে থাকে, পেঁপে গাছগুলো চেয়ে চেয়ে দেখে, ভাঙ্গা পাঁচিল মরা গাছ, কাক শালিক বুলবুলির ঝাঁক যখন তখন মায়ার হাত পা দেখছে হাঁটু দেখছে পিঠ কোমর ভুরু চোখ চুল নখ সব। রাগ করে না ও, বরং খুশি হয়। যদি ওরা এমনভাবে ওর দিকে তাকিয়ে না থাকত তো তার মনে হ'ত না সে বেঁচে আছে। সুতরাং—

দুপুরে খাওয়ার পরে চোখে আজ ঘুম আসেনি। শুতে গিয়ে শোয়া হ'ল না। এক আশ্চর্য নেশায় মন শরীর আচ্ছন্ন হয়ে রইল। সত্যি তো। মরা মাদার গাছ কি নোনাধরা পাঁচিলটা যদি হঠাৎ মুখ ফুটে ব'লে ওঠে, 'চমৎকার! কত সুন্দর তুমি', অথবা 'তোমাকে দেখে বর্ষার রজনীগন্ধা কি বৈশাখের চাঁপার কথা মনে পড়ে আমাদের', তো সে কি খুব অবাক হবে? হয়নি। এখনও হ'ল না। বরং নূপুর বাজার মতন উত্তেজনায় আনন্দে তার রক্তের মধ্যে মিষ্টি রিমঝিম একটা শব্দ হচ্ছিল। সেই কখন থেকে। শোয়া ছেড়ে এক সময় ও উঠল। আস্তে দরজার দু'টো পাল্লা ভেজিয়ে দিয়ে উঠোনের দিকের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিল। তারপর এসে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। ঠিক মাঝ জায়গায় দাঁড়ালেই দেওয়ালের আরশীতে ও পায়ের নখ থেকে সিঁথির ডগা পর্যন্ত সব দেখতে পায়। না, আরশী মুখ করে দাঁড়ালেও সব দেখা যায় কি। ব্লাউস খুলে ফেলল, শাড়ি সায়ার বাঁধন খুলে পা দিয়ে একদিকে সব ঠেলে সরিয়ে দিল ও। আর সেই মুহূর্তে আয়নার দিকে তাকিয়ে ও স্তব্ধ হ'য়ে গেল। যেন রক্তের বাজনাটাও কিছুক্ষণের জন্য থেমে রইল। না, নিজের এই মূর্তি সে আগে কখনও দেখেনি, এভাবে! ডালিম গাছ। পাতা ফুল ফল কাণ্ড শাখায় শাখায় ছড়িয়ে পড়া

যৌবনের সতেজ প্রগলভ লাবণ্য। পুলকের বিদ্যুৎ-শিহরণ তার মেরুদাঁড়ায় খেলা ক'রে গেল, টের পেল মায়া। আর রক্তের বাজনাটা যেন প্রচণ্ড শব্দ ক'রে তখন বেজে উঠল ঝমঝম। ঘরের চালে শব্দ হ'চ্ছিল, বাইরে, গাছের পাতায়, পাঁচিলের গায়ে, কুয়োতলায়, ডুমুর জঙ্গলে। আকাশ ভেঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামল, আর আয়নার সামনে নাচের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে কোটিবার ও নিজেকে দেখল।

অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল এটা। একদিন দু'দিন তিনদিন। এবং সেই সঙ্গে আর একটা জিনিস ও লক্ষ্য করল। অবশ্য তাতে প্রথম দিন ও ভয়ই পেয়েছিল, দ্বিতীয় দিন আব ভয়টা রইল না, মনটা একটু খারাপ লাগল। কিন্তু, অবাক হ'ল মায়া, তৃতীয় দিন তার মনে হয় এ-ই স্বাভাবিক। প্রণবের কথা হাসি ওঠা বসা খাওয়া বিশ্রাম, তার জুতোর শব্দ সিগারেটের গন্ধ অফিসের গল্প, বা মায়া রাঁধতে বসেছে আর পাশে ব'সে স্বামী তার গলার কি পিঠের ঘামাচি খুঁটছে কি বিড়বিড় করে বাজারের হিসাব বলছে ইত্যাদি সব কেমন যেন মায়ার কাছে পুরোনো, বড় বেশি এক ঘেয়ে ঠেকতে লাগল। যেন জন্মাবধি সে এসব দেখছে শুনছে। যেন শুনে শুনে দেখে দেখে এখন তার হাঁপিয়ে ওঠার সময় এল। এমন কি রাতটাও। আদর চুমু আবেগ উচ্ছ্বাস সঙ্গম কোনো কিছুর মধ্যেই আর ও দিশেহারা হয়ে যেতে পারছিল না। যেন কতকাল ধ'রে চলছে। যেন এসব কাজ এখন কিছুদিনেব জন্য বন্ধ থাকলে ভাল হয়। বিছানার গন্ধ প্রণবের গায়ের গন্ধ চটচটে ঘাম আর গরম নিশ্বাসের হল্কা থেকে রেহাই পেতে সত্যি ও এক সময় উঠে পড়ে। 'এর মধ্যেই তোমার জল তেষ্টা পেয়ে গেল!' ঠাট্টার সুরে প্রণব বিড়বিড় করে। কিন্তু মায়া উত্তর দেয় না। গম্ভীর থাকে। সবটা আবহাওয়া তার কাছে অশ্লীল কুৎসিত ঠেকে। বিছানার অন্ধকারে আধশোয়া স্বামীকে কুৎসিত মনে হয়। বেশ

বাস ছেড়ে নিজেকে কুৎসিত মনে হয়। অথচ—অন্ধকার জানালায় একলা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে ও ভাবে।

প্রশ্নের জবাব দেয়নি ভুবন। ঘাড় গুঁজে মাছ কুটছিল। জলপচা শাদাটে ক'টা পেটফোলা ট্যাংরা মাছ। একটা ভোঁতা কাটারির বুকে পুছিয়ে পুছিয়ে পেট আলগা ক'রে মাছের কালচে তামাটে রঙের নাড়ি-ভুঁড়ি বার করতে করতে ভুবন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যেন লোকটার নিশ্বাসের ঝাপটায় মাছির ঝাঁক ভনভন ক'রে ওঠে। কিছু তার নাকের সামনে কিছু ঘাড়ের কাছে পিঠের ধারে উড়ে বেড়ায়।

'আপনার বুঝি বঁটি নেই?'

ভুবন শুধু মাথা নাড়ল, কথা বলল না বা চোখ তুলে চৌকাঠের দিকে তাকাল না।

মায়া একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'বঁটি থাকলে সুবিধা হ'ত। ছোট মাছ কাটারি দিয়ে কুটতে কষ্ট।' বলে মায়া ঘাড় ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকায়। আজকের দুপুরের চেহারাটা অন্যরকম। বৃষ্টিও পড়ছে আবার রোদও উঠেছে। সিল্কের মত শাদা নরম মেঘে মোড়া আকাশ থেকে কে যেন একটা রূপালি জাল ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। রূপার সুতোর মতন শাদা ফিনফিনে বৃষ্টির ছাঁট এসে থেকে থেকে মায়ার পায়ের কাছে মাটি ভিজিয়ে দিচ্ছে। মাটি ঘাস গাছের পাতা ভাল ক'রে ভিজতে না ভিজতে আবার দেখা যায় ঝকঝকে রোদের হাসি। লাল ফড়িং না। ঘাস-ফুলের মত ছোট্ট শাদা একটা প্রজাপতি ওর থুঁতনির কাছে উড়ে উড়ে বেড়ায়। মায়া ঘাড় ঘুরিয়ে ভুবনের দিকে তাকাল। এবার ও খুশি হ'ল। ফ্যাকাশে হলদে চোখ জোড়া মেলে মানুষটা হা ক'রে তাকে দেখছে। মায়া বাঁ পা নামিয়ে ডান পা-টা চৌকাঠের ওপর রাখল।

'তা কারখানার কাজ কি ক'রে গেল বললেন না তো?'

শুক্‌নো মরা পোকায় খাওয়া গাছের বাকলের মতন বুড়োর ঠোঁটের চামড়া ঈষৎ বিস্ফারিত হ'ল। বোঝা গেল হাসতে চেষ্টা করছে। বাঁ হাতের পিঠটা কপালে ঠেকিয়ে আবার হা ক'রে সে মায়ার মুখের দিকে তাকায়। অর্থাৎ অদৃষ্টে নেই তাই চাকরি গেছে। বুঝতে পেরে মায়া একটু সময় চুপ ক'রে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'যাক, হাতের কাজটা যখন শেখা আছে কোনো রকমে চলে যাচ্ছে—যাবে। ঘরে ব'সে টুকিটাকি সারাইয়ের কাজ করছেন মন্দ কি।'

কিন্তু চোখ দেখে মনে হ'ল না ভুবন তা ভাবছে। কি ভাবছে চিন্তা না ক'রে মায়া আবার উঠোনের দিকে মুখ ফেরাল। ভিমরুলের চাকের মতন প্রকাণ্ড খোঁপার পরিবর্তে অল্প বয়সের একটি মেয়ের মতন চেরা বেণী আজ ও ঘাড়ের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিয়েছে। হাওয়ায় দু'টো বেণী নড়ছিল। স্কুলে পড়ার সময় বেণী করত ও। বৌ হবার পর আজ এই প্রথম। আর এই বেণী তৈরী করার সময় অনেকদিন পব এক ধরনের বনজ লতার কথা বাব বাব মনে পড়ছিল তাব। প্রণব এভাবে চুল বাঁধা পছন্দ কববে না এটাও মায়া চিন্তা করেছে এবং স্বামী বাড়ি ফেরার আগেই ওটা ভাঙ্গতে হবে ভেবে তার বুকের মধ্যে বেশ একটু টনটন করছিল। খসখস শব্দটা শুনে মায়া চমকে ঘাড় ফেবাল। ভুবন এবার দাঁত বার ক'বে রীতিমত হাসছে।

'কি হ'ল? মাছ কোটা তো শেষ হয়েছে, এবার রান্না চাপান।'

'তা চাপাব, এক সময় চাপালেই হ'ল।' হাত নেড়ে মাছের গায়ের মাছি তাড়ায় ভুবন। 'রান্না আর খাওয়ার কথা এখন বড় একটা ভাবি না, দিদি, কেমন যেন ইচ্ছাই করে না, হি-হি। একটা কাজ ছিল শেয়ালদার। বুঝিয়ে দিয়ে ফেরার সময় এই তো আজ

আট দিন পর দু'টো মরা ট্যাংরা আনলাম। রান্নাই বা আর রোজ হয় কোথা,—'

মায়া চুপ ক'রে রইল।

হাওয়াটা একটু বেশি জোরে বইছিল ব'লে পিঠের বেণী দু'টো একজোড়া সাপের মতন পরস্পর জাপটা জাপটি ক'রে আবার কোমরের দু'দিকে সরে গিয়ে হিলহিল করছিল। যেন সাপের খেলা দেখতে বুড়ো চোখ বাঁকা করে ঘাড় কাত করে মায়ার পিঠের দিকে চেয়ে থাকে। ঘোলা জলের ওপর রোদ পড়লে যেমন একটা চিক-চিকে শাদাটে আভা জাগে বুড়োর চোখে আজ আবার সেই রং দেখল মায়া। কিছু বলল না ও, বরং ক্ষুদে প্রজাপতিটা এইবেলা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে, উড়ে উড়ে এসে ওর গলায় বুকে বসতে চেষ্টা করছে দেখে মায়া সেটাকে একসময় খপ করে মুঠোর মধ্যে ধরে ফেলে পরে ওটাকে উঠোনের দিকে ছুঁড়ে দিতে ঘুরে দাঁড়ায়। এবার ভুবন তার সবটা পিঠ ও কোমর দেখতে পাবে মায়া অনুমান করছিল। বাচ্চা প্রজাপতিটা বাইবে ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ মরার মতন শুয়ে থেকে পবে একসময় নড়ে চড়ে উঠে দিব্যি উড়তে উড়তে পেয়ারা গাছেব দিকে চলে গেল। মায়া খুক্ ক'রে হাসল। ভুবনও হাসল। মায়া ঘুরে দাঁড়াল।

'মবেনি। ভাবলাম হাতের চাপে চটকে শেষ হয়ে গেছে।'

'কেন মরবে?' ভুবন ঘাড় নাড়ল। 'নরম মুঠো। এই চাপে কি আর ও মরে।'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শাদা প্রজাপতিটাকে আর দেখতে পেল না। পেয়াবা পাতার ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

'ভারি সুন্দর ছিল, এই এতটুকুন!'

ভুবন ঘাড় নাড়ল। ফাটা শুকনো রোদ পোড়া গাছের বাকলের মতন পুরু ঠোঁট দুটো ছড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আরো সুন্দর লাগছিল দিদির থুঁতনির চারপাশে যখন ও ঘুরঘুর করছিল। মাছ!

মাছ কুটব কি ছাই। আমি তখন থেকে কেবল ভাবছি কোন্ ফুলের সঙ্গে কোন্ ফলের সঙ্গে এই থুঁতনির তুলনা চলে। মচ্‌কা ফুল—না না না, করবী ফুলের তলার দিকটা, ছোট্ট বাটির মতন গোল হয়ে বোঁটার সঙ্গে যেটুকু লেগে থাকে,—অবিকল সে রকম। দিদির থুঁতনি দেখলে তাই মনে পড়ে। মিছা বলছি? আর একবার যখন আরশীতে মুখ দেখবেন কথাটা সত্য কিনা বুঝবেন।'

মেরু দাঁড়ায় একটা শিহরণ অনুভব করত মায়া, কিন্তু তা করতে গিয়েও সে ওটা আর টের পেল না। তাই আগের চেয়েও শান্ত স্থির চোখে ও ভুবনের মুখের দিকে তাকাল। একজন পুরুষের মুখে ও রূপের প্রশংসা শুনছে কি? না না, যা-ও একটু হাসির রোদ লেগে ঘোলাটে চোখ দুটো চিকচিক করছিল এখন আবার মরা মাছের চোখের মতন ঠাণ্ডা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। কাঠের টুকরোর মতন শুকনো হাঁটুর সঙ্গে দুটো হাত ঠেকানো। বরং ক্ষীণ একটা বেদনার ঢেউ বুকের মধ্যে অনুভব করল মায়া। অল্প হেসে বলল, 'তা দেখব আরশীতে, দেখা যাবে সত্যি আমার থুঁতনি অত সুন্দর কিনা। আপনি এইবেলা উঠুন। আসুন। আমি জল তুলে দিই আপনি মাছটা ধুয়ে ফেলুন। অনেক বেলা হ'ল।'

দু'জনের পায়ের শব্দে গিরগিটিটা ওধারের পাঁচিলের মাথা থেকে লাফিয়ে ডুমুর জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। মায়া থমকে দাঁড়ায়। পিছন থেকে ভুবন বলল, 'আমি না হয় এতকাল কোণার দিকের ভাঙ্গা ঘর নিয়ে ছিলাম, এখন উঠোনের এধারে নতুন ঘর তুলেছে বটব্যাল। আর ঘর তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভাড়াটেও পেল, এখন তো জঙ্গলটঙ্গলগুলো একটু সাফ করে ফেলা উচিত ওর, কিন্তু, শালা কি এদিকে একবার উঁকি দিতে আসে? মাসকাবার হলে ভাড়া গুণতে হাজির হবার বেলায় ঠিক আছে।'

'না খুব বেশি জঙ্গল কি।' মায়া বলল, 'আমার কিন্তু এই গাছটাছগুলো বেশ ভালই লাগছে। সস্তার মধ্যে বাড়িটা চমৎকার।'

একটা নিশ্বাস ফেলল ভুবন।

'আমার ইচ্ছা করছে এই আগাছাগুলো তুলে ফেলে এধারটায় কিছু ফুলের গাছ করি।'

মায়া কথা বলল না।

'তা এবছর আর হয় না।' পিছন থেকে ভুবন পরে বলল, 'আরো আগে পুঁতলে তবে ঠিক হ'ত। এখন বীজ পুঁতলে শালার জলেই সব পচে ভূত হয়ে যাবে গাছ বেরোবে না। আর গাছ বড় হতে হতে শীত এসে যাবে। শীতে আর দো'পাটি তেমন ফোটে কই। উঁহু।'

'হ্যাঁ, সুন্দর।' ঘাড় ফিরিয়ে মায়া বলল, 'দো'পাটি ফুল আমি খুব পছন্দ করি। ছোটবেলায় দেখতাম আমাদের স্কুলের বাগানে,—এমন দিনে গাছগুলো শাদা হয়ে থাকত।'

'শাদা লাল গোলাপী অনেক রঙের হয়।' ভুবন আস্তে আস্তে বলল, 'আমার ইচ্ছা লাল দো'পাটি করার। লাল ফুল দিদির বেণীতে মানাবে ভাল।'

মায়া হঠাৎ আবার কথা বলতে পারল না। ভুবনও চুপ করে রইল। কিন্তু কুয়োতলায় গিয়ে মুখ খুলল। মায়া জল ঢালছে আর দু'হাতে রগড়ে মাছের গায়ের ছাই ময়লা সাফ করতে করতে কি ভেবে সে বলল, 'ছোটবেলার কথা ইস্কুলে পড়ার দিনগুলোর কথা দিদির খুব বুঝি মনে পড়ে।'

প্রথমটায় উত্তর দিল না মায়া, তারপর একসময় আস্তে আস্তে বলল, 'মনে পড়লেই আর কি করা যায়। দেখতে দেখতে বড় হলাম, স্কুল ছাড়লাম, তারপর বিয়ে হয়ে গেল।' একটু থেমে পরে বলল, 'হাজারবার মনে পড়লে কি ইচ্ছা করলেও এখন আর সেদিন ফিরে পাব না।' নিজের মনে কথাটা বলে শেষ করে বিষণ্ণ চোখ দুটো ও আকাশের দিকে তুলে ধরল। রোদের আভা মুছে গিয়ে কালো বড় বড় মেঘের আনাগোনা আরম্ভ হল এবার। মাছ ধোয়া

শেষ করে ভুবন সেগুলো রং-চটা ফুটো লোহার থালাটায় তুলে রেখে লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'আর জল ঢালতে হবে না?' মায়া চোখ নামাল।

'না, আমার হয়ে গেছে।' ঘাড় তুলে ফ্যাকাশে চোখে ভুবন ওর আপাদমস্তক দেখে। কুয়োর বাঁধানো কার্নিশের ওপর একটা পা, এক পা নিচে ইঁটের ওপর রেখে মায়া হাতের শূন্য বালতিটা একটু একটু আন্দোলিত করছিল বলে ওর বুক কোমর উরু মন্থর ঢেউয়ের মতন থেকে থেকে দুলছে কাঁপছে।

'মন, দিদি। ছোটবেলার মনটা যদি আমরা কোনোরকমে ধরে রাখতে পারি তো বুড়িয়ে গিয়েও মাঝেসাঝে সে-দিনের নাগাল পাই। মিছা বলছি?'

আকাশে চোখ তুলল মায়া। চমকে ওঠার মতন কাউকে দেখছে না ও, কি কারো কথা শুনছে না। নিমগাছটা বুলবুলিদের ফল খাওয়াতে খাওয়াতে সারা দুপুরই এই বুলি আওড়ায়। উঠোনেব চড়ুইগুলো, ওধারের ফড়িং দুটো, ডুমুব জঙ্গলেব ছায়ায় ঝিঁঝিব দল সারাক্ষণই কি ডেকে ডেকে মায়াকে একথা শোনাচ্ছে না। আর, এটা ও বেশ বুঝতে পারে ওদের সঙ্গে সুব মিলিয়ে এবাড়ির শ্যাওলা ধরা ইঁটের পাঁজা নড়বড়ে ভাঙ্গা দেওয়াল, হয়তো মৃতপ্রায় হলুদ বঙের পেঁপে গাছটাও ফিসফিসে গলায় কেবল এই বলছে। এখন?

শান্ত সহানুভূতির চোখে মায়া ভুবনকে আবাব দেখল।

'যান, এইবেলা গিয়ে উনুনটা ধরিয়ে ফেলুন—অনেক বেলা হ'ল।'

ভুবন স্থির। নির্বাক।

একটা বেণী ঘাড় ডিঙ্গিয়ে ওর বুকের ওপর লুটোয়। চোখ বাঁকা করে মায়া তাই দেখে। এমন সময় হঠাৎ এক আঁজলা বোদ ওর বুকের সামনে দিয়ে থুঁতনি ঘেঁষে উড়ে গেল। এক ঝাঁক প্রজাপতি। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ। হাতের তেলোর মত বড় এক

একটা। ওরা ডালিম গাছটা লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। যেন দিশাহারা হয়ে হাতের বালতিটা ঠক্ করে একদিকে ছুঁড়ে ফেলল মায়া। ছুটল। পেয়ারা গাছের ডালে আঁচল বেঁধে গেল, নিচের দিকেও কি একটা কাঁটায় শাড়ির পাড় আটকে ওর মোরগফুল আঁকা সায়া বেরিয়ে পড়েছে। কোনোমতে সামলে নিয়ে আবার এগোয়। ধরল একটাকে। বাঁ হাতের লম্বা সরু দুটো আঙুলের মাঝখানে আলতো করে একটা পাখা চেপে ধরে ও কুয়োতলায় ফিরে এল। ডান হাতের মুঠোয় আঁচলটা। বুকের ওপর চেপে রেখেছে কোনোরকমে। শ্বাসপ্রশ্বাসে জায়গাটা কাঁপছে।

এই প্রথম ভুবন শব্দ ক'রে হাসল। যেন জং ধরা খসখসে গলায় নতুন ধাতুর ধার শোনা গেল।

মায়া মুখ কালো ক'রে ফেলল।

প্রজাপতিটাও হাত থেকে উড়ে গেল।

আঁচলটা অতিরিক্ত দ্রুততার সঙ্গে বুকে জড়ালো গলায় তুলল ও এবং অন্য দিকে ফিরে তাকাল। কিন্তু কতক্ষণ ?

এদিকে আবার ওকে তাকাতেই হয়।

তাকিয়ে অবশ্য নিশ্চিন্ত হয়। কাঠ। মরা কাঠ চুপ ক'রে ব'সে আছে। দুটো হাত শুকনো নিষ্পত্র গাছের ডাল। জীর্ণ বাকল। ভিতরের শাঁস পুড়ে গেছে। অঙ্গার দেখা যায়।

'উঠে ঘরে যান। সেই কখন তো মাছ ধোয়া হ'ল। খাওয়া দাওয়া করবেন না!'

'আমি হা করে তাকিয়ে দেখছিলাম।'

'খুব বড় প্রজাপতি! এত বড় প্রজাপতি এখানে এসে আর আমি দেখিনি।' মায়া বলল।

'আমি প্রজাপতি দেখছিলাম না।'

মায়া বুড়োর চোখের মধ্যে তাকায়।

ঘোলা ফ্যাকাশে চোখ স্থিরভাবে ধ'রে রেখে ভুবন হাসে।

'দিদির ছুটে যাওয়া দেখছিলাম। আহা রাজহংসীর গতিভঙ্গি। কথাটা মিছে বলছি ? আয়নায় দেখবেন। ঘাড় ঘুরিয়ে যদি সম্ভব হয়। আমি এমন সুন্দর ছাঁদের পিঠ কোমর আর কারো দেখিনি।'

'দেখব আয়নায়, রোজই তো দেখছি।' ধমকের সুর বার করতে গিয়ে ও কোমল গলায় হাসল। 'এই বেলা উঠুন, চলুন আমি উনুন ধরিয়ে দিই। আষাঢ়ের বেলা তা-ও হেলতে শুরু করেছে।' মায়া নুয়ে হাত বাড়িয়ে মাছের থালাটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'কত ভাললোকের সংসর্গে আছি।' পিছনে চলতে চলতে ভুবন বলল। 'দিদির মন কত নরম !'

ডুমুরতলার নিচু চালার ভিতরে ঢুকল দু'জন আর সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামল। কয়লার ব্যবহার নেই বুঝতে কষ্ট হয় না। কবে যেন কয়লা আনা হয়েছিল। দু'চার খণ্ড এক কোণায় পড়ে আছে। তার উপর উঁইয়ের ঢিবি মাথা জাগিয়েছে।

ভুবন বলল, 'মাঝে মধ্যে রান্নাবান্না যে না করি দিদি তা না, ওই ওধারের পুরোনো বেড়ার বাঁশ কাঠ কিছু কিছু ভেঙ্গে এনে কাজ চালাই আর কি।' একটু থেমে পরে বলল, 'তা কাঁচা ঘর বটব্যাল এমনিও রাখবে না। আস্তে আস্তে সবটাই পাকা ক'রে ফেলবে। তখন আমাকেও উঠতে হবে বৈকি।'

'পরিবার সংসার কোনদিনই ছিল না নাকি ?' উনুন সাজিয়ে আগুন দিতে তৈরি হবার আগে মায়া একবার ঘাড় সোজা করল। তার গলার বুকের উদ্ধত পেশীর সুন্দর ভঙ্গি দেখতে ভুবন ফ্যাকাশে চোখে আবার রং আনতে চেষ্টা করছে টের পেয়ে মায়া ঘাম মুছবার অছিলায় আঁচলটা নামিয়ে কোলের ওপর জড়ো করল। তারপর একটা পোকা বা মাকড়ের দিকে স্থির সতর্ক দৃষ্টি রেখে টিকটিকি যেমন চুপচাপ বসে থাকে কতক্ষণ ও সেভাবে বসে 'রইল। কেনই বা থাকবে না। কুয়োতলায় যখন ও স্নান করে খোলা গায়ে সাবান মাখে পাশের মুমূর্ষু মাদার গাছটা পিটপিট চোখে তাকিয়ে থেকে

থেকে পরে হঠাৎ এক সময় যখন ওর সঙ্গে কথা বলে শব্দ করে নিশ্বাস ফেলে তখন কি ও অন্তত কিছুক্ষণের জন্য সতর্ক সন্দিগ্ধ চকিত হয়ে ওঠে না! ধারালো দৃষ্টি হেনে গাছটাকে পরীক্ষা করার পর মায়া নিশ্চিন্ত হয়। চমক ত্রাস জয় করে আবার স্বাভাবিক গলায় গানের গুনগুনি তুলে বুকে পিঠে সাবান ঘসে। এখনও তাই হ'ল। বাদলা দুপুরের পচা ভ্যাপসা গরম তার ওপর ভুবনের পুরোনো ছোট্ট আবর্জনায় ঠাসা ঘরের অস্বস্তিকর গুমোটে ঘেমে ও স্নান ক'রে উঠছিল। কপালে গলায় ঘাম। গলার নিচে বুকে স্তনের পাশে পাশে মুক্তাবিন্দু হয়ে মুহুর্মুহুঃ ঘাম জমছে আর পর মুহূর্তে তারা ভেঙ্গে গলে ঝরে পড়ছে। সবল সুস্থ হাতে আঁচল ঘসে ঘসে মায়া ঘাম মুছল। ভুবনের দিক থেকে চোখ সরাল না। যেন শরীরটাকে আরও একটু স্বাস্তি দিতে শাড়ি সায়া গুটিয়ে হাঁটুর খানিক নিচে পর্যন্ত তুলে ধরল। তারপর আশ্চর্য ঠাণ্ডা নরম গলায় প্রশ্ন করল: 'লঙ্কা পেঁয়াজ ঘরে আছে? পচা মাছ রসুন ছাড়া চলবে না কিন্তু।'

'দেখি, হয়তো আছে। যেন অত্যন্ত অনিচ্ছায় নধর সুডৌল পায়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে ভুবন ঘরের এদিক ওদিক দেখে। 'রসুন থাকতে পারে, পেঁয়াজ যেন ফুরিয়ে গেছে।'

'নিয়ে আসুন, আমি উনুন ধরিয়ে দিলাম।'

ভুবন লঙ্কা পেঁয়াজ খুঁজতে উঠে গেল।

কিন্তু ফিরে এসে দেখল উনুন ধরেনি, কেবল গলগল ক'রে ধোঁয়া উঠছে। আর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এক জোড়া চোখ ছুরির ফলার মতন চকচকে ঝকঝকে হয়ে গেছে।

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হ'ল।

'দিদির চোখের দিকে তাকাতে ভয় করে।'

'কেন, কিসের ভয়।' মায়া নরম গলায় হাসল।

'বাঘিনী বনের মধ্যে শিকার খুঁজছে, সে রকম দৃষ্টি, সেই চোখ।' খসখসে গলায় ভুবন হাসে। 'মিছা বলছি না কিন্তু।'

মায়া কথা বলল না।

বৃষ্টিটা আরো জোরে চেপে এল।

কিন্তু জলের ঝমঝম ছাপিয়ে বাইরে অদ্ভুত একটা ডাক শোনা গেল। যেন ঘরের পিছনে অসহ্য উল্লাসে একটা ভুতুম পাখি গলা ছেড়ে ডাকছে।

আর সেই মুহূর্তে দপ্‌ ক'রে উনুনে আগুন জ্বলে উঠল।

ভুবন খুশি। কালো চোখের মধ্যে আগুনের নাচ দেখতে পেয়ে মুখটা মুখের কাছে সরিয়ে আনল। 'দিদির চোখ জোড়া আরো সুন্দর আরো ভয়ানক লাগছে এখন।'

'কি রকম, কিসের মতন শুনি?' গর্বে নাসারন্ধ্র স্ফুরিত করল মায়া।

'যেন বাঘিনী শিকার ধরেছে। খুশির রক্তে হু'চোখ লাল।' খসখস ক'রে ভুবন হাসে।

মায়া কথা বলে না। কি ভাবে। তারপর আগুনের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আপনার ঘরে আরশী আছে?'

ভুবন মাথা নাড়ল। 'ছিল। ভেঙ্গে গেছে।'

'তবে আর কি।' যেন তাচ্ছিল্যের শীতলতা দিয়ে মায়া চোখের আগুন নিভিয়ে দিল।

'নিন, পেঁয়াজটা ছাড়িয়ে ফেলুন। বসে থাকলে রান্না নামবে কি। শিলনোড়া থাকলে দিন চট ক'রে লঙ্কা হু'টো বেটে নিই। হলুদ কোথায়?'

মরা মাছের ফ্যাকাশে চোখ তুলে ভুবন ঘরের এদিক ওদিক দেখে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বে উঠে যায়। কাঠ। মরা গাছ চোখের সামনে হাঁটছে। বিদ্যুত শিহরণ মেরুদাঁড়ার অর্ধেক পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেল টের পেয়ে মায়ার কান্না পায়। বাঁ-হাতের কনিষ্ঠা ঠোঁটে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে ও ভাবে।

অফিস থেকে প্রণব সকাল সকাল ফেরে।

ফজলি আম নিয়ে এল, এক ডিবি পাউডার কিনে আনল।

মায়া দেখে হাসল। তা বিকেলে ও সেজেছিল ভাল। সুন্দর খোঁপায় এতবড় একটা নীল অপরাজিতা গোঁজা। সিঁদুরের ফোঁটাটা টকটক করছে সিঁথিমূলে। অপরাজিতা রঙের ব্লাউস। ব্লাউসের সঙ্গে মিলিয়ে হালকা কমলা রং শাড়ি। ঠোঁটে রং আছে কি না প্রণব বুঝতে পারল না। তোয়ালের কোণায় আলতা লাগিয়ে ঠোঁট ঘসা হতে পারে। প্রণব অনুমান করল। তার ঘরে লিপ্‌স্টিক নেই।

'নাও, এইবার পাউডারটা মেখে ফেল। পাউডার তো ফুরিয়ে ছিল।'

'অফিস থেকে তাই তাড়াতাড়ি বেরিয়েছ কি। আমার সুন্দর মুখের কথা ভেবে? বিকেলে কতক্ষণে পাউডার মেখে সাজব বলে!'

'তা, তুমি কি মনে কর। তোমার কি মনে হয় না সারাক্ষণই আমি একটি মুখের কথা ভাবি? অফিসে যেতে, অফিসে ব'সে, অফিস থেকে বেরিয়ে?'

'বাড়াবাড়ি। তুমি যে আমার কথা মনে কর না তা আমি কখনো মনে করি না। বরং দুঃখ, একটু বেশি মনে রাখো বলে। একটু কম ক'রে যদি রাখতে আমি সুখী হ'তাম। আমার জীবন সুখের হ'ত।' মায়া একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলল।

আর ঘাঁটানো ঠিক হবে না ভেবে প্রণব চুপ ক'রে গেল। কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত-মুখ ধোয়। পাউডার ও আম সরিয়ে রেখে মায়া চা করতে বসে।

ফুরফুরে একটা হাওয়া বইছিল।

বাদলা দুপুরের পর রোদ লাগা বিকেল বড় চমৎকার। ভালয় ভালয় চা খাওয়াটিও হ'ল। এক সঙ্গে ব'সে মুখোমুখি হয়ে ব'সে গল্প করল দু'জন।

একটা হলদে প্রজাপতি হু'জনের মুখের সামনে ওড়াউড়ি করল। সেই হুপুরের ডালিম ডালে বসা প্রজাপতি। দেখে তখনকার ছবিটা মনে হ'তে মায়া চুপ ক'রে রইল।

'কতবড় পতঙ্গ!' একবার ইচ্ছা করছিল তার প্রণবকে বলে। বলে : 'সুন্দর আরো কত জিনিস পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে একবার চোখ মেলে দেখো।' কিন্তু একটা জরুরী কথা এসে যাওয়াতে মায়ার আর তা বলা হয় না। ইচ্ছা করেই চুপ ক'রে রইল। তারপর অবশ্য ও কাজের কথায় মুখ খুলল : 'তা তোমার যখন বন্ধু তখন ওটা ক'রে ফেল না। একটু কমিয়ে টমিয়ে দেবে খরচ। এ-বয়সে প্রিমিয়াম চালাবার সাহস যদি না পাও তবে আর কবে পাবে, আর হবে কি।'

প্রণব চুপ ক'রে মায়ার মুখ দেখে কথা শোনে।

'আমি তোমায় এটুকুন বলতে পারি। তিন হাজর টাকার ইন্সিওর করেও এই আয়ে আমরা সুন্দর চালিয়ে যেতে পারব। হু'টি তো মুখ। তুমি আর আমি। কিচ্ছু কষ্ট হবে না প্রিমিয়াম চালাতে।' মায়া চুপ করল।

প্রণব স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলল। মায়া মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকায়। মনের ভাব বুঝতে পেরেছে আশঙ্কা ক'রে প্রণব চুপ করে রইল। খরচ চালাতে পারবে কি পারবে না। ভবিষ্যতে এই সংসারে তিনটি মুখ হবে কি চিরকাল তারা এমনি হু'জন থাকবে। পলিসির চাঁদা চালাতে অসুবিধাটা কি ইত্যাদি আলোচনা আপাতত চাপা দিতে প্রণব হঠাৎ শব্দ করে হাসল।

চমকে উঠল মায়া।

'খুব খুশি দেখছি!'

'একটা মজার গল্প তোমাকে বলা হয়নি। আজ শুনলাম।'

প্রণব ঝুঁকে গলাটা বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু গল্প শুনতে স্ত্রীর খুব আগ্রহ নেই চোখের রং দেখে সে টের পেয়ে আবার গম্ভীর হয়। সোজা হয়ে বসে।

'উঠি, উনুনে আঁচ দিতে হয়।' হাই তুলে মায়া বাইরে উঠোনে গাছের মাথায় সোনার পাঁতের মতন রোদের শেষ ঝিকিমিকি দেখে। প্রজাপতিটা উড়ে বেরিয়ে গেছে। কোনদিকে গেছে মায়ার চোখে পড়ছিল না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এক জোড়া বুলবুলি প্রাণপণে যত পারছিল ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে নিম ফল খেয়ে নিচ্ছিল। পাখার ঝাপটায় পাতায় জমে থাকা বৃষ্টির জল ফোঁটা ফোঁটা হয়ে নিচে ঝরছিল। ডুমুর জঙ্গলের দিকে চোখ গেল মায়ার। এবাড়িতে ওখান থেকে অন্ধকার নামে, সন্ধ্যা শুরু হয়। এর মধ্যেই দুটো জোনাকি এসে জুটেছে ওধারে। একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল মায়া।

'গল্পটা শুনবে?' ভয়ে ভয়ে প্রণব প্রশ্ন করল।

'কার গল্প কিসের গল্প!' মায়া ঘাড় ফেরালো না।

'অফিসে সুকুমার আমাকে বলল, সুকুমার ভঞ্জ।'

মায়া নীরব।

'সুকুমারদের পাড়ায় ঘটনাটা ঘটেছে।'

কিন্তু ওপক্ষের কোনোরকম উৎসাহ নেই লক্ষ্য করে প্রণব আবার দমে যায়। চুপ করে থাকে। মায়া উঠে দাঁড়ায়। 'চলি —উনুনে—'

যেন শেষ উদ্যম নিয়ে প্রণব বেশ বড় গলায় হাসল: 'গল্পটি শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে, তুমি বিশ্বাসই করবে না যে—'

'আহা বলো না, এতক্ষণে তো বলা হয়ে যেতো।' বিরক্ত কণ্ঠস্বর। যেন গল্পটা অগত্যা শুনতেই হবে, না হলে আর একজন ভীষণ অসন্তুষ্ট হবে চোখমুখের এমন ভাব প্রকাশ করে মায়া ধপ্ বেতের চেয়ারটায় বসে পড়ল। 'কি গল্প শুনি?'

'সুকুমারদের পাড়ায় এক ভদ্রলোক তার বাড়ির ঝিকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। পরশুর ঘটনা। এদিকে বাড়িতে কান্নাকাটি। বেশ বড় বড় দু'তিনটি ছেলে মেয়ে। স্ত্রী, হ্যাঁ, ভদ্রলোকের স্ত্রীও

যে অসুন্দরী এমন না। দিব্যি দেখতে শুনতে মহিলা। সুকুমার দেখেছে। কাল চার পাঁচবার নাকি ফিট্‌ হয়েছে। 'মহিলার দাদা এ জি অফিসের বড় চাকুরে। খবর শুনে ছুটে এসে কাল নাকি থানায় খবরও দিয়েছেন—কিন্তু তাতে কি আর—হা-হা।' শব্দ করে প্রণব হাসল। 'সুকুমারদের পাড়ায় সে এক বিশ্রী হৈ-চৈ—'

কিন্তু স্ত্রীর ভুরু দেখতে দেখতে প্রণবের হাসি মিলিয়ে গেল।

বড় তাড়াতাড়ি সে গম্ভীর হয়ে যায়। মনে হচ্ছিল সে নির্লজ্জের মত হেসেছে।

'কি রুচি তোমার, কী বিশ্রী স্বভাব!' মায়া চেয়ার ছেড়ে উঠল। 'এই গল্প শোনাতে তুমি পাগল হয়ে ছুটে এসেছ ঘরে।' একবার থামল, উঠোনের ঘাসের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল একটুক্ষণ, তারপর প্রণবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল মায়া।

'তুমি কি জান না যে এসব গল্প আমি কোনোদিনই ভালবাসি না। তোমায় কি আমি একদিন বলিনি যে এসব কুৎসিত ঘটনা ইচ্ছা হয় তুমি গিয়ে আর কাউকে শোনাবে। আর কাউকে যতক্ষণ খুশি বসে থেকে রসিয়ে ফেনিয়ে বলে শেষ করে তবে ঘরে ফিরবে। আমাকে না, আমার কাছে এসব ' রাগে মায়া কাঁপছিল। 'ছিছি, —কোন্‌ ভদ্রলোক বাড়ির ঝির সঙ্গে পালালো, কোন্‌ লোক অফিসের টাইপিস্ট মেয়ে দেখে ভুলেছে, কোন্‌ ছেলে বাসে-দেখা মেয়ের কাছে প্রেমপত্র লিখল এসব ছাড়া কি পৃথিবীতে আর গল্প নেই, ঘটনা ঘটে না? আমি অন্য রুচির মানুষ। আমি কক্ষনো এসব কুৎসিত বাজে ছাই-ভস্ম কথাবার্তা ভালবাসি না, শুনি না। যদি ভাল কথা সুন্দর কথা অফিসের বন্ধুদের কাছে শোন বাড়ি এসে বলো, সারারাত বসে কান পেতে শুনব, শুনতে রাজী, বুঝলে।'

'হিতে বিপরীত হ'ল।' একলা চুপ ক'রে অন্ধকার বারান্দায় বসে প্রণব ভাবল। স্ত্রীর অন্তরঙ্গ হওয়ার জন্য এই গল্প

না করে অন্য কোনো প্রসঙ্গ তোলা উচিত ছিল। কি প্রসঙ্গ, এমন কোন্ বিষয় আছে যে, শুনলে মায়া খুশি হ'ত। প্রণব তার ছবছরের বিবাহিত জীবনকে আর একবার সূক্ষ্মভাবে জরীপ করল। করে কিছু দেখতে না পেয়ে পেয়ারাতলার অন্ধকারের দিকে চেয়ে ছিল। অন্ধকারে একটা বিড়াল ঘুরঘুর করছিল। প্রকাণ্ড ধুমসী বিড়াল। ছাই রঙের। ধোঁয়া রঙের। যেন এই জন্যই দৃশ্যটা আরো খারাপ লাগছিল। তাকাতে ইচ্ছা করছিল না প্রণবের। অস্পষ্ট এলোমেলো চঞ্চল ঘোলাটে। বোঝা যায় না কোন্টা বিড়াল কোন্টা অন্ধকার। গুলিয়ে যায়। যেন এই ধরনের বিবাহিত জীবন তার। পুরুষের কাছে নারী এর চেয়ে স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন হয়ে ধরা দেয় না। দেবে না! এক খাবলা অন্ধকার। হঠাৎ নড়েচড়ে সক্রিয় হয়ে ওঠে, তারপর চলন্ত ধূর্ত শিকারী মুখের গবমবক্ত মুছে চোখের নিমেষে জমে আবার অন্ধকার হয়ে যায়। পেয়ারাতলার চাপচাপ অন্ধকারের কিছুটা! নিরবয়ব দুর্বোধ। অস্তিত্বকে বেণু রেণু করে বহস্যের অতল অন্ধকারে মিশিয়ে দিতে নিশ্বাস ফেলার শব্দটি না করে সংসারের সাত কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে মায়ার জুড়ি আর কেউ আছে কিনা চিন্তা করে প্রণব যেমন ক্রুদ্ধ হ'ল তেমনি হতাশ হ'ল। হতাশই বেশি হ'ল। যা স্বাভাবিক। সুখী না, বিয়ে করে এই জীবনে কেউ সুখী না। বন্ধুরাও বলে বটে। কেন সুখী না, কি দিয়ে সুখী না তার চুলচেরা হিসাব অবশ্য আজ পর্যন্ত কেউ দেয়নি। প্রণব তার নিজের সম্পর্কে একটা প্রামাণ্য হিসাব কারো কাছে তুলে ধরতে পেরেছে কি। পারল না। পারে না বলেই বুকের মধ্যে এক টুকরো কান্না নিয়ে মাটির অন্ধকার থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকায়। একটি মোটে তারা সেখানে। কিন্তু তা হলেও ঘোলাটে অন্ধকারের চেয়ে সূচের আগার মত সূক্ষ্ম উজ্জ্বল এক বিন্দু আলোর মধ্যে অনেক বেশি শান্তি অনেক আশা লুকিয়ে থাকে। রাত বাড়লে

আলোর ফুটকি বাড়ে আশার ইসারা আকাশে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে। কোন্ এক বন্ধু তাকে পরামর্শও দিয়েছিল। স্ত্রীর সঙ্গে খিটিমিটি বাধলে, কথায় কাজে না বনলে চুপচাপ বসে রাত্রির অপেক্ষা করবে। আর এক মুঠ অন্ধকার তোমার চারপাশে নামুক আরো কিছু তারা মাথার ওপর ঝিকমিক করুক। তারপর। তাই চুপচাপ একলা অন্ধকারে মশার কামড় সহ্য করে বসে থেকে প্রণব গাঢ় গূঢ় রাত্রির অপেক্ষা করে। এটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে তার।

মায়া?

প্রণবের মত বাজে ভাবনাচিন্তা তার কোনোদিনই নেই।

আজও ছিল না।

বরং ততক্ষণ ক্ষিপ্র সুন্দর হাতে ও নতুন করে ঘর ঝাঁট দিল। বিছানা পাতল। আলো জ্বালল। আরো যা কিছু শোবার ঘরের টুকিটাকি কাজ শেষ করে শেষবারের মতন দেওয়ালের আয়নায় মুখখানা একবার দেখে নিয়ে আস্তে আস্তে রান্নাঘবেব দিকে চলল। শোবার ঘরের পিছনে ছোট্ট চালা।

কিন্তু সেখানে পা দিয়ে তখনি তার আলো জ্বালতে ইচ্ছা হল না। অন্ধকার চালার নিচে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে ও বাইরের দৃশ্যটা দেখে। কাদের বাড়ির একটা লিচু চারা, একটা নাবকেল গাছ ওধারে। তারপর আকাশ। আকাশের কিনারে শাদা এক পোছ আলোর ইসারা জেগেছে। তার অর্থ চাঁদ উঠছে। এখনি উঠবে। একটা অদ্ভুত সময়। বৃষ্টির ভিজে হাওয়া মায়ার চোখেমুখে লাগল।

আর ঠিক তখন ও শুনতে পেল কোনদিকে গাছের পাতার আড়ালে একটা পাখি যেন ঠোঁট ঘসছে। হয়তো পাখি পাখির ঠোঁট ঘসে দিচ্ছে। দৃশ্যটা কল্পনা করে মায়ার রোমাঞ্চ হ'ল। ইচ্ছা ক'রে ও খোঁপাটা খুলে ফেলল। ঘাড়ের কাছে বেণীটা একটু সময়

সাপের মতন প্যাঁচ খেয়ে লেগে থেকে তারপর হঠাৎ লাফিয়ে পিঠ বেয়ে কোমরের ওপর এসে ঝুলতে লাগল।

একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় মায়া। একটু ঝুঁকে ঈষৎ বাঁকা হয়ে। আঁচলটা আর ঘাড়ে লেগে থাকে না লুটিয়ে নিচে পড়ে।

বস্তুত তখন মায়ার সৌন্দর্য যে দেখেছে সে বলবে!

কিন্তু কে দেখবে।

কেউ দেখবাব নেই বলে ভিজে হাওয়ার মতন একটা ভারি নিশ্বাস তার বুক ঠেলে গলার কাছে উঠে এসে যন্ত্রণা করতে থাকে। কিন্তু অল্পক্ষণ। খুব অল্প সময়ই প্রণবের জন্য ও দুঃখ করে। কেননা মায়া জানে এখানে এখন চাঁদ ওঠার দৃশ্য দেখতে প্রণবকে ডেকে আনলেও সে তা দেখতে পাবে না। পারে না। সেই চোখ নেই। পাখির ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকানোর শব্দ? সেই কান নেই। কেন নেই, আব কি নেই স্বামীর ভাবতে মায়া আজ বড় একটা গ্রাহ্য করে না। ভুলে থাকে। একটু একটু কবে দু' বছরেব অভ্যাসের পর এখন, আজ, নিজেকে ও বেশ সবল শক্ত মনে করছিল। আর এই জন্যই প্রণব কাছে ছিল না বলে তার এত ভাল লাগছিল।

ডুমুব জঙ্গলের মধ্যে গিরগিটিটা হঠাৎ কর্কশ শব্দে ডেকে উঠল। মায়ার বুকটা কাঁপল। একবার। পবমুহূর্তে ও সহজ স্বাভাবিক হয়ে ববং মনের স্ফূর্তিটাকে একটা সম্পূর্ণ রূপ দিতে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে উড়ন্ত জোনাকিটাকে ধরে ফেলল। জোনাকি ছুঁলে কি হয় ছেলেবেলায় শোনা কথাটা মনে হতে ও ঠোঁট টিপে হাসল। এখন যথেষ্ট বড় হয়েছে, রাত্রে বিছানায় সেটি করার ভয় অবশ্য নেই ভেবে মায়া নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ বিস্ফারিত করে যেন প্রায় শব্দ করে আর একবার হাসল, তারপর পোকাটাকে দেখতে লাগল। হাতের মুঠ খুলে আবার বন্ধ করল ও। আবার খুলল। খুঁটিতে আর ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে না থেকে পা ছড়িয়ে বসল। ইঁট দিয়ে এক চিলতে

বাঁধানো জায়গা। পা ঝুলিয়ে বসলে নিচের ঘাসে পায়ের গোড়ালি ঠেকে। মায়ার এটা ভাল লাগে। সাপের আস্তানা হবে ভয় দেখিয়ে প্রণব সব ঘাস কেটে ছেঁটে জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলতে চেয়েছিল,—মায়া দেয়নি। সাফ করতে হয় সাপের ভয় থাকে সামনের দিকের উঠোন পরিষ্কার কর। এটা নয়। রান্নাঘরের পিছনের এই ঘাস লতা আগাছার জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে মায়ার। তার নিজস্ব জগত। এখানে আর কারোর হাত লাগানো কি হাত বাড়ানো ও বরদাস্ত করে না। বলতে কি, ঘাসের মাথায় পা ঠেকলে পায়ের তলা যখন খসখস করে মায়ার খুব ভাল লাগে। চোখ বুজে ও এই খসখসটা অনুভব করে। যেন হাল্কা পাতলা মেয়েলি পা পেয়ে ঘাসের শিসগুলো ইচ্ছামতন সুড়সুড়ি দিতে থাকে। না, প্রণব একদিন ছোট্ট একটা পালক (সম্ভবত পায়রার) দিয়ে তার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়েছিল, বেশ কিছুদিন আগে, কিন্তু মায়ার তা ভাল লাগেনি। বরং তার রাগ পেয়েছিল। মুখে বলেনি যদিও কিছু। কিন্তু চোখ মুখের এমন ভাব করেছিল ও যে, তারপর আর একদিনও প্রণব এ ধরনের রসিকতা করতে সাহস পায়নি। কেন ভাল লাগেনি কেন খারাপ লাগল তা নিয়ে মায়া মাথা ঘামায় না। শুধু ঘটনাটা তার মনে আছে। এখানে এখন ঘাসের শিসে পা ঠেকিয়ে সেদিনের কথা ভেবে ও হাসল। বস্তুত প্রণবের অধিকাংশ কাজই কেন ভাল লাগে না একদিন ঠাণ্ডামেজাজে বসে ভেবে দেখবে মায়া ঠিক করে রেখেছিল, কিন্তু বসা আর হয় না, যেন সময়ই পাচ্ছে না ও। বস্তুত যে জিনিস ভাবতে গেলে মন প্রফুল্ল না হয়ে বিষণ্ণ অবসাদগ্রস্ত হয় তাকে নিয়ে বসতে তার জন্য কিছুক্ষণ সময় নষ্ট করতে যেন প্রকৃতিই তাকে দিচ্ছে না। প্রণবকে নিয়ে ও যে কী মুশকিলে পড়েছে তা যদি ঈশ্বর জানত!

চমকে উঠল মায়া। হাতের মুঠ আলগা করে আলোর পোকাটাকে দেখতে না পেয়ে ও অবাক হ'ল, হতাশ হ'ল। একটু

ভাবতে গেছে আর তখনি এমন সুন্দর জিনিসটা হারিয়ে ফেলল! এদিক ওদিক তাকাল ও, হাতের পিঠ দেখল, পা, পায়ের নিচের ঘাস—কোথাও নেই। তা ছাড়া উড়ে যেতেও তো পারে না। যা-ই ভাবুক, যতক্ষণই ভাবুক মায়া চোখ বুজে ছিল না। উড়ে যাবার সময় পোকাটাকে ও দেখতে পেত। না, আছে! এমন একটা জায়গা বেছে নিয়ে দুষ্টু এসে বসবে মায়ার স্বপ্নের বাইরে। কখন এল? চোখ ফেরাতে পারছিল না মায়া। ভিজে হাওয়ার স্পর্শ পেতে এখানে এসেই ও ব্লাউসের বোতাম খুলে দিয়েছিল। প্রণব না থাকলে খালি-গা হয়েই বসত। (গায়ে জামা না-রাখা প্রণব পছন্দ করে না। দিনের বেলা এমনকি রাত্রেও। দরজায় খিল না দেওয়া পর্যন্ত, আলো নিভিয়ে বিছানায় না ঢোকা পর্যন্ত মায়া বুক পিঠ ঢেকে রাখবে—হ্যাঁ, দাবী ছাড়া একে আর কি আখ্যা দেবে মায়া, স্বামীর দাবী? ভাবতে মায়ার বিশ্রী হাসি পায়, করুণা করে ও লোকটাকে মনে মনে। যাক সেসব।) এখন ও স্বপ্নাচ্ছন্নের মত নিজের বুকের দিকে চেয়ে রইল। দু'টো স্তনের মাঝখানে সরু ঢালু জায়গাটুকুতে একটা সবুজ মুক্তা হয়ে স্থির হয়ে বসে আছে জোনাকিটা। মুক্তার গা থেকে ঠিকরে পড়া হাল্কা সবুজ আলোয় তার স্তন দু'টো এখন সত্যিকারের কাঁচা ফলের মতন দেখাচ্ছে। বিদ্যুৎ শিহরণ খেলা করে গেল মেরুদাঁড়ায়। মায়া অনুভব করল নিজের বুক দেখে এত বেশি মুগ্ধ অভিভূত ও আর কোনোদিন হয়নি। আর একদিনও না। ওকি? উড়ে যাচ্ছে! উড়ে গেল? হা করে চেয়ে রইল মায়া। হাত উঠল না। হাত বাড়িয়ে আবার ওটাকে ধরবার তিলমাত্র চেষ্টাও করল না ও। বরং চরম তৃপ্তির পব দারুণ আলস্য ও অবসাদ নিয়ে মানুষ যে চোখে কোনো একটা কিছুর চলে যাওয়া দেখে ঠিক সেভাবে ও চুপচাপ ডুমুরতলার অন্ধকারের দিকে আলোর পোকার উড়ে যাওয়া দেখল। কতক্ষণ এমনি স্থির হয়ে একভাবে বসে কাটাল মায়ার খেয়াল ছিল

না। যখন খেয়াল হল দেখল গাছের পাতা চুঁইয়ে জল পাড়ার মতন বর্ষারাত্রির নীল ঠাণ্ডা জ্যোৎস্না তার নরম শরীরের ওপর একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে। আলস্য ভঙ্গের হাই তুলে ও উঠে দাঁড়াল। ওধারে পেঁপে গাছের কাণ্ড আর নোনাধরা দেয়ালের মাঝখানে একটুকরো মাকড়সার জালে কখন জানি দু'এক ফোঁটা বৃষ্টির জল লেগে ছিল, জ্যোৎস্না পড়ে এখন চিকচিক করছে অল্প হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপছে। না, উত্তরদিকে শাদা একটা ডেলা ছাড়া আকাশে আর কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। ঘাড় উঁচিয়ে মায়া সবটা আকাশ দেখতে চেষ্টা করল, তার নিজের ঘরের চালের জন্য বাকিটুকু দেখা গেল না যদিও। তা হলেও মায়ার মনে হল আজ রাত্রে আর বৃষ্টি হবে না। কী যে ভাল লাগছিল ওর। যেন শরতের রাত ভেবে একটা টিয়া পাখি কিচমিচ শব্দ করতে করতে রান্নাঘরের চাল ঘেঁষে একদিকে উড়ে গেল। কোনো আতাগাছে গিয়ে বসবে হয়তো, মায়া ভাবল, না কি কামরাঙ্গা গাছে ?

হ্যাঁ, হঠাৎ ভীষণ খারাপ লাগল তার কথাটা মনে হতে। এখন উনুন ধরাতে হবে। যদি উনুন না ধরায় ও, যদি রান্না না করে, আজ, একটা রাত কি চলে না। খুব চলে। কেন চলবে না। অন্তত মায়ার কোনো অসুবিধা হয় না। আম আছে। প্রণব ফজলি আম এনেছে। একটা আস্ত আম যদি খায় ও তো ভাতের দরকার হয় না। কিন্তু প্রণব পারবে কি ? ভাত না হলে ? প্রস্তাবটা দেবে কিনা ভেবে মায়া ইতস্তত করতে লাগল। এক পা অগ্রসর হয়ে আবার দাঁড়াল ও। প্রণব কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? কেন জানি কেবলই মনে হচ্ছিল তার, বারান্দার চেয়ারে বসে প্রণব ঘুমোচ্ছে।

বরদাসুন্দর বটব্যালের শহরতলীর (ধরুন না টালা) এক জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বাড়ির ভাড়াটে দম্পতির রান্নাখাওয়ার বিস্তারিত বর্ণনা করতে গেলে গল্প দীর্ঘ হয়ে যাবে। কেবল এইটুকু বললে চলবে যে, মায়াকে রান্না করতে হ'ল। প্রণব চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েনি।

পায়চারি করছিল সিগারেট টানছিল। চিন্তামগ্ন। কিছু ভাবছে বুঝতে পেরে মায়া কাছে ঘেঁষেনি।

আয়োজন সামান্য। ভাত আর ইলিশমাছের ঝোল। চট্ করে রান্না হয়ে গেল। দুজনে খেতে বসে কথা হ'ল না।

যেন দু'জনেই ভাবছিল এখন কেউ কাউকে ঘাঁটাবে না। ভালয় ভালয় খাওয়াদাওয়াটা শেষ হোক।

খাওয়া সেরে লবঙ্গ মুখে দিয়ে প্রণব পিঠটা এলিয়ে দিয়ে বিছানায় বসল।

এঁটো বাসন জড়ো করে রেখে হাত ধুয়ে মুখ মুছে মায়া ঘরে এল।

প্রণব হাত বাড়িয়ে হ্যারিকেনের আলো চড়িয়ে দিল।

মায়া চিরুনী হাতে আয়নার সামনে দাঁড়ায়।

শোবার আগে চুল আঁচড়ানো তার চিরদিনের অভ্যাস। মায়া পান খেয়েছে। ইলিশমাছ খেয়ে মুখে আঁশটে গন্ধ লাগছে ব'লে পান খেয়েছে। এমনি অভ্যাস নেই। প্রণব পান খায় না। কা'কে দিয়ে মায়া পানের খিলিটা কিনিয়ে এনেছে প্রণব জিজ্ঞেস করল না। কেবল লাল টুকটুকে এক জোড়া ঠোঁটের দিকে সে চেয়ে রইল।

'ব্লাউসটা খুলে ফেল না হয়, খুব ঘামছ।'

মায়া শব্দ করল না বা প্রণবের দিকে তাকাল না।

সিলিংএর দিকে চোখ রেখে প্রণব চুপ করে রইল।

চিরুনী চালাবার সময় মায়ার হাতের চুড়ির রিণঠিণ শব্দ হয়। মায়ার হাত মাথা চুলের ছায়া এই এত বড় হয়ে দেয়াল ও সিলিং পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ছায়ার দীর্ঘ ঢেউ হয়ে চুলটা উঠছে নামছে দুলছে। আর সেই ঢেউ-এর বুকে চিরুনীর ছায়াটা একটা ছোট্ট নৌকো হয়ে নেচে নেচে চলেছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে প্রণব দৃশ্যটা দেখল। একটা

পোকা ঘরে ঢুকেই আলোর কাছে ছুটে এসে হ্যারিকেনের চিমনির গায়ে ঠোক্কর খেয়ে নিচে ছিটকে পড়ল। মেঝের আবছা অন্ধকারে পোকাটাকে আর দেখা গেল না।

'আলো নিভিয়ে দেব?' মায়া ঘুরে দাঁড়ায়।

'তোমার হয়ে গেছে?' উৎসাহের চোখে প্রণব স্ত্রীর মুখ দেখল ও পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসল।

'হওয়া আর কি।' তেমন ভাল করে কথার উত্তর দিল না মায়া। চিরুনী রেখে দিয়ে চুলে প্যাঁচ তুলে কোনোরকমে একটা এলো খোঁপা করে রাখল।

'আলো নিভিয়ে দিই?' মায়া আবার বলল।

'যা ঘামছ, জামাটা খুলেই ফেল।' প্রণব ঈষৎ ঝুঁকে বসল।

'ঐ তো, একবারেই খুলব।' মায়া আলোটা দেখতে লাগল।

'কেন, এখন খুললে দোষ কি?' প্রণব ইচ্ছা ক'রে সামান্য হাসল।

মায়া নীরব।

'খুলে ফেল শাড়িটাও খুলে ফেল, দোরে খিল দিয়েছি। জানালা আটকানো। হ্যাঁ, ওটার একটা পাল্লা খোলা আছে। আমি ভেজিয়ে দিচ্ছি।' হামাগুড়ি দিয়ে প্রণব বিছানার লাগোয়া জানালার পাল্লাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে বসল।

মায়া মুখ তুলছিল না।

ভুরু পর্যন্ত হ্যারিকেনের আলো লেগেছিল ওর। কপালটা অন্ধকার ছিল বলে অসংখ্য কুঞ্চন প্রণব দেখতে পেল না, তাই সাহস করে গলাটা একটু ভিজিয়ে মোলায়েম সুরে বলল, 'না না আমি তো বলছি, তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি। খোল। অন্ধকারে একরকম, আলোর সামনে দেখতে আর এক রকম। সেই বিউটি আলাদা। আর আমি আমার স্ত্রীকে দেখছি। অন্য কাউকে না।'

স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে মায়া ক্ষীণ হাসল। হাসির মধ্যেও ছু'টো চোখ জ্বলছিল। প্রণব ঢোক গিলল।

'না না রিয়্যালি বলছি। আমি যে অন্যায় কিছু করছি না ; আমি যে, আমিও যে তোমার মতন বাইরের এত লোকের এত সব কীর্তি কত বেশি অপছন্দ করি এটা তোমার কাছে প্রমাণ করতে তোমাকেই দেখতে চাই। এতকাল শুধু অন্ধকারে দেখছি আজ আলোর মধ্যে দেখব। এর চেয়ে পবিত্র কাজ আমার পক্ষে আর কি আছে তুমিই তার রায় দাও।'

একটা টিকটিকি ঘরের চালে ডেকে উঠল।

একটা ভীষণ আপত্তি আঙুলের মাথায় ঝুলিয়ে রেখে মায়া ব্লাউসের বোতাম খুলতে লাগল।

প্রণব একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

'আমার চেয়ে ভাল রুচি যে আর কারোর নেই তুমি কি আজ ছু'বছর, বিয়ের রাত থেকে কালকের রাত পর্যন্ত টের পাওনি? রিয়্যালি আমি আন্তরিকভাবে ঘৃণা করি স্বকুমারদের পাড়ার সেই ভদ্রলোকদেব ক্লাসেব লোককে। ছি ছি ছি, শেষ পর্যন্ত ঝি! আমার উচিত হয়নি জঘন্য খবরটা এনে তোমার কানে তোলা।'

'যাক, আব বেশি বকতে হবে না। যেটি দেখবার তাই এখন চোখ ভবে ত্যাখো।' যেন বাগ ক'বে ব্লাউসটা দলা পাকিয়ে মায়া বিছানায় ছুঁড়ে ফেলল।

একটু সময়েব জন্য প্রণব নিশ্বাস ফেলল না। নরম কণ্ঠা থেকে স্ত্রীর উন্মুক্ত স্বকুমার নাভিদেশ পর্যন্ত বাব বার চোখ বুলোল সে।

'হয়েছে?' মায়া একটা চোরা ঢোক গিলল। 'এই বেলা আলো নিভিয়ে দিই। শুতে দাও।'

'বা-রে, রয়ে গেল যে!' প্রণব মাথা নাড়ল। আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। অল্প হাসল। 'শাড়ি ছাড়লে না? ওটাও খুলে ফেল।'

'না।'

'কেন।'

'লজ্জা করে, ভাল লাগে না।'

প্রণব একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ত্যাগ করল।

'লজ্জা করে।' একটু থেমে পরে সে বলল, 'বলো ভাল লাগে না, আমাকে তোমার ভাল লাগে না তাই এরকম করছ।'

'কি রকম ?'

প্রণব কথা বলল না।

'আলোর মধ্যে আমার শরীর দেখতে চাইছ, কেন, অন্ধকারে বিছানায় যখন শুই তখন তো গায়ে সুতোটিও বাখ না। দু'বছর এভাবে দেখে কি তৃপ্ত হওনি।'

'হইনি হইনি।' যেন প্রবল ক্রোধে প্রণব এবার ফেটে পড়ল। 'কাল রাত্রে হইনি, পরশু রাত্রে ফাঁকি দিয়েছ। বিছানায় রেখেও তৃপ্তি পাই না শান্তি পাইনা বলে এখন বাতির আলোয় তোমার রূপ দেখতে চাইছি। কিছুটা ক্ষতিপূরণ হোক।'

'ও সেইজন্যেই ক্ষোভ।' মায়া আঁচলটা তুলে বুকের ওপর জড়ো করল। একটু পায়চারি করল। দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে আয়নার সামনে একবার দাঁড়াল। তারপব আস্তে আস্তে প্রণবের সামনে ফিরে এল।

'সেই চিন্তা সেই ধ্যান তোমার। এইজন্যেই ঘরে আলো রেখে নিজেকে আমি দেখাতে চাই না।' মায়া খুব আস্তে বলল না। তাতে অবশ্য ক্ষতি হ'ল না। বেশ কিছুক্ষণ আগেই সুন্দর ফুটফুটে জ্যোৎস্নার আকাশ মেঘে মেঘে কালো অন্ধকার হয়ে উঠেছিল। এখন ঝমঝম করে বর্ষণ শুরু হ'ল। যেন হুতুম পাখিটা অসময়ে দু'বার ডেকে উঠল।

আলো নিভিয়ে মশারির ধারগুলো টেনে দিতে দিতে মায়া

বলতে লাগল 'সেই পাপ চোখের সামনে নিজেকে খুলে ধরতে লজ্জা করে বৈকি। ভালও লাগে না।'

'বেশ তো, যাকে ভাল লাগে তাকে দেখাও তার সামনে সব খুলে মেলে দাঁড়িও।' প্রণব দেয়াল ঘেঁষে বিছানার একপাশে শুয়ে রইল। 'আমি আর দেখতে চাইব না।'

'কে দেখছে, কাকে দেখাচ্ছি যদি জানতে তো তোমার মন একটু উন্নত হ'ত। রোজ রাত্রে আমার এই শরীরের জন্যে তুমি এমন হ্যাংলামো করতে না।'

'অ, তা হ'লে কেউ দেখছে', শ্লেষের সুর বার করল প্রণব। 'তাহলে বলো এমন কেউ আছে যাকে সব দেখিয়ে সব দিয়ে তৃপ্তি পাও, আমাকে না?'

'হাঁ, আমার রূপ আমি আকাশকে দেখাই, বাতাস এসে আমার গায়ের গন্ধ শোঁকে, গাছ, গাছের পাতা, শালিক বুলবুলিরা আমার যৌবন দেখে। কোনো মানুষ না, পুরুষকে দেখাই না। তোমাকে দেখে পুরুষ জাতটার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে, অন্তত আমার।'

'কখন দেখাও', যেন একটু হাসতেই চেষ্টা করল প্রণব। 'আকাশের নিচে কোথায় বসে সব খুলে মেলে দাও, আমাকে বলতে পার?'

'ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখো।' মায়া শুয়েছিল। রাগ করে উঠে বসল। 'নিশ্চয়ই আমাকে একসময় স্নান করতে হয়, কাপড় বদলাতে হয়। ইতর অভদ্র কোথাকার!'

কিছুক্ষণ আর কথা শোনা গেল না প্রণবের। যখন শোনা গেল মনে হল ঘুমে কথাগুলো গাঢ় ভারি হয়ে গেছে। অভিমানেও হতে পারে, মায়া ভাবল।

'তাই তো বলি তোমার মতিগতি বোঝা ভার। তাই তো বন্ধুরা বলে নারী-চরিত্র। আর এদিকে সারাক্ষণ আমি ভেবে ভেবে

মরি। পাউডার ফুরোতে না ফুরোতে পাউডার নিয়ে এলাম। ফজলি আমের চালান এসেছে এক টাকার আম কিনে আনলাম।'

'সস্তা জিনিস দিয়ে সস্তা জিনিস আদায় করো। আমার কাছে পাবে না। তেরো বছরের খুকির কাছে গিয়ে এই কান্না কেঁদো—পাবে। আমি আর তোমার কান্নায় গলে যেতে রাজী নই যত খুশি চোখের জল ফেলো।'

সত্যিই প্রণব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। যেন বালিস ভিজে যাচ্ছে।

একটা বিশ্রী গুমোটে মায়ার মাথা ধরেছিল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে তার ভাল লাগল। কান খাড়া করে শুনল। হঠাৎ আবার বৃষ্টিটা থেমে গেছে। টের পাচ্ছিল ও। আস্তে আস্তে বিছানার দিকের না, উল্টোদিকের জানালায় সরে গিয়ে দুটো পাল্লা খুলতে বাইরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে গেল ও। আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। 'মেঘের পর রৌদ্রের মতন।' মায়া মনে মনে বলল। 'রাত্রেও চাঁদের আলো আর বৃষ্টির লুকোচুরি খেলা চলছে।' যেন কোনদিকে কদমফুল ফুটেছে। ভিজে হাওয়ায় টাটকা গন্ধ ভেসে আসছিল।

এক পা এক পা ক'রে ও আর একবার বিছানার কাছে সরে এল। নাক ডাকছে, কাঁদতে কাঁদতে এইবেলা প্রণব ঘুমিয়েছে। কান খাড়া ক'রে রাখল ও একটু সময়। আর ঠিক তখন মায়া শুনল বাইরে পাতার ঝোপে একটা পাখি ডানা ঝাড়ছে। একসঙ্গে অনেকগুলো জলের ফোঁটা ঝরে পৃথিবী আবাব চুপচাপ। নিঝুম।

চিকরিকাটা আলপনায় ভুবনের পৈঠা ভরে গেছে। ডুমুর পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো পড়ে পড়ে এই কাণ্ডটি হয়েছে। এক সঙ্গে এত আলো-ছায়ার ঝিলিমিলি দেখে মায়ার চোখের পলক

পড়ছিল না। আর তাকেও অপরূপ দেখাচ্ছে। অজস্র জ্যোৎস্না ও ছায়া বুকে মুখে মেখে খুঁটি ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে মায়া বসে আছে। একদৃষ্টে ভুবন তাকিয়ে দেখল।

'নিন ধরুন।'

'ছি, এতগুলো ফুল নিয়ে এলেন—মালা! দো'পাটির মালা। কোথায় পেলেন?'

'বৌবাজার।' খসখসে গলায় ভুবন উত্তর করল। 'স্টোভটা সারিয়ে পার্টিকে বুঝিয়ে দিতে আমাকে যেতে হ'ল কি না। বাজারের ভিতর দিয়ে ফিরছিলাম হঠাৎ চোখে পড়ে গেল।'

মায়া কথা বলল না।

'নিন পরুন মালাটা, খোঁপায় আটকে দিন। একবার চেয়ে দেখি কেমন লাগে।

'এলো খোঁপা।' ভুবনের হাত থেকে মালাটা তুলে নিয়ে মায়া ক্ষীণ গলায় হাসল। 'ভাল দেখাবে কি।'

'সবরকম খোঁপাতেই ভাল দেখাবে। দিদির এই চুলে দো'পাটি গুঁজলেই হ'ল।'

'শাদা ফুল।'

'রাত্রে খুলবে ভাল। রাতের চুলে শাদা ফুল মানায়।'

খোঁপায় মালা জড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে মায়া বাইরের উঠোন দেখে। জলে জ্যোৎস্নায় গাছের পাতাগুলো চিকচিক করছে। হাওয়ায় নড়ছে। পেয়ারা পাতা থেকে টুপটাপ রূপালি জল ঝরছে।

'সেই তুপুর থেকেই মগজে দো'পাটি ফুল ঘুরছিল। কপাল ভাল পেয়ে গেলাম, দিদিকে সাজাতে পারলাম।'

মুখ ফিরিয়ে মায়া শব্দ না করে হাসল। কি একটা চিন্তা করে আস্তে আস্তে বলল, 'সাজাবার সাজ দেখবার এত শখ। তাই তো জিজ্ঞেস করছিলাম, পরিবার সংসার কি কোনদিনই নেই, ছিল না?'

শুকনো পাতার খসখস শব্দ হল ভুবনের গলায়।

'ছিল দিদি, তা সেসব ইচ্ছে করে বলিনি, কি হবে বলে।'

'তা, শুনি?'

'একবার না তিনবার। তিন তিনটে পরিবার ঘরে আনলাম, একটাও থাকেনি।' ভুবন চুপ করল।

'কোথায় ওরা?'

'প্রথমটা মরেছে কলেরায়, দ্বিতীয়টা মরল ছেলে বিয়োবার সময়, হুঁ মরা ছেলে বেরিয়েছিল। আর শেষেরটা পালাল আমাদের কারখানার এক ছোকরার সঙ্গে। তা-ও তো ক'বছর হয়ে গেল।'

কথা শুনে মায়া চমকে উঠল না, মরা কাঠের জীর্ণ কাঠামোটার দিক থেকে বিস্ময়ে ও চোখ ফেরাতে পারছিল না যদিও। কিন্তু কথা তখনও শেষ হয়নি, একটু থেমে ভুবন বলে, 'এখন আবার আমাদের উল্টাডাঙ্গার শশী বায়না ধরেছে। আজ ছ'মাস ধরে ঝোলাঝুলি করছে। হুঁ, একটা মেয়ে আছে ওর হাতে। বিধবা ভাগ্নীর মেয়ে। সোমত্থ মেয়ে কাঁধে নিয়ে মাগি ভারি বিপদে পড়েছে, তাই শশী ঘুরঘুর করছে।'

জলতরঙ্গের মিষ্টি বাজনার মতন মায়ার নরম হাসির ধ্বনিতে চারদিকের আলো-ছায়া কাঁপে। আবার কোনদিকে পাতার আড়ালে পাখি ডানা ঝাপটায়। হাসি থামতে মায়া বলল, 'বলেন কি, এই বয়সে আবার! আপনি সাহস পান?'

'পাই না, সাহস পাচ্ছি না বলে তো শশীকে কথা দেওয়া হচ্ছে না।'

'না, না, পারবেন না। সাহস করবেন না।' ব্যস্ত হয়ে মায়া বলল, 'শশীকে বলে দিন এই বয়সে আর ওসব হয় না।'

'তা বুঝি, তা কি আর বুঝি না দিদি।' মুখের কাছে মুখ

সরিয়ে এনে আবেগে ভুবন হিসহিস করে উঠল। 'কিন্তু পিপাসা যে মেটে না, পিপাসার যে নিরবিত্তি নেই।'

পাথরের মতন স্থির শক্ত হয়ে গেল মায়া। এক মুহূর্ত। তারপর অনায়াস সহজ ভঙ্গিতে মরা গাছের জীর্ণ ডালের বেড় থেকে নিজেকে মুক্ত করল, ক'রে সোজা হয়ে বসল। ফ্যাকাশে ঘোলা চোখে কতটা রক্তের জোয়ার এসেছিল আবছা অন্ধকারে বুঝতে না পেরে কেমন একটু অসহায়বোধ করল ও। তা হলেও সেই ভাবটা কাটাতে ওর দেরি হয় না, আস্তে আস্তে বলল, 'শশীকে বারণ ক'রে দিন, বুঝলেন, শশীকে ব'লে দিন যে এ বয়সে আর—'

'বলব, আমি মনে মনে ঠিক করে ফেলেছি, শশীকে শেষ কথাটা বলে দেওয়াই ভাল।'

হঠাৎ আর কথা বলে না মায়া। ঘাড় ফিরিয়ে উঠোন দেখে। যেন নিজের ঘরের দিকে চোখ যেতে কি ভাবে।

'কি, কর্তাবাবু কি জেগেছেন, এইবেলা জাগবেন?' ভুবন গলা বাড়িয়ে দেয়। মায়া নিঃশব্দে মাথা নাড়ল, থুথু ফেলল, যেন থুথু ফেলতেই উঠোনের দিকে মুখ বাড়িয়েছিল ও। তারপর ঘুরে বসে শান্ত মোলায়েম গলায় বলল, 'এই জংলা ছিটের শায়াটা আমাকে কেমন মানিয়েছে বলছেন না তো, কেমন দেখাচ্ছে?'

খসখসে গলায় ভুবন হাসল।

'বলব, বলছি, ওটা পরনে দেখে তখন থেকেই তুলনাটা আমার মনের মধ্যে কেবল নড়াচড়া করছে। চিতাবাঘিনী, বনের চিতার মতন চমৎকার সরু ছিমছাম মাজাঘসা কোমর দিদির।'

'তাই নাকি, ঘরে গিয়ে আয়নায় দেখব তুলনাটা ঠিক হ'ল কিনা।'

'কেন, আবার আয়না কেন, আমার চোখকে কি দিদির বিশ্বাস হয় না?' যেন এই প্রথম ভুবনের গলায় দুঃখের আওয়াজ বেরোলো।

'বুড়ো হয়ে গায়ের বল গেছে বটে কিন্তু ভেতরে রসের বাল্ব্ জ্বেলে রেখে দৃষ্টিটাকে আয়নার মত ঝকঝকে ক'রে রেখেছি ছানি পড়তে দিইনি, দিদির কি এখনো বুঝতে বাকি।'

যেন এই প্রথম মায়া ভয় পেয়ে আঁৎকে উঠল, এই প্রথম তার কান্না পেল, কিন্তু কোনোটাই ও হ'তে দিলে না। ভয় কান্না দু'টোকেই জয় করার আশ্চর্য ক্ষমতা নিজের মধ্যে অনুভব করল ও। তাই উষ্ণ কোমল হাতটা মরা শুকনো কাঠের গায়ে তুলে দিয়ে অবলীলাক্রমে ও হাসল। 'বিশ্বাস করি, তা না হ'লে কি আর দুপুর রাত্রে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এই আয়নার সামনে দাঁড়াই, নিজেকে দেখি, বলুন?'

আটপৌরে

স্ট্রীট ডাইরি খুলে নারকেলডাঙ্গার সেই রাস্তা খুঁজে পেতে অরুণের কষ্ট হয় নি। সেই থেকে ডাইরির পাতায় পেন্সিলের আঁচড় কেটে জায়গাটাকে যত না বেশি চিহ্নিত করল, তার চেয়ে বেশি আঁচড় কাটল সে নিজের মনের ওপর। ভেবে ভেবে প্রায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল সে কদিনে। সংসারের আর সব কাজকর্ম থেকে মন বারবার সরে গেল। দূর অতীতের ঝাপ্‌সা হয়ে যাওয়া স্মৃতি নতুন পোশাক পরে তার চোখের সামনে ঘোরাফেরা করতে লাগল। একবার শুধু দেখে আসতে দোষ কি! একদিন টালি-ছাওয়া, টিনের বেড়া-দেওয়া ঘরগুলোর একটার কাছে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। পাশে খোলা কাঁচা ড্রেন। ওধারে তেলে-ভাজার দোকান। ধুলোর ঘূর্ণি উড়ছে মাটির রাস্তাটায়। কি ভাববে, কি মনে করতে পারে প্রতিভা। অরুণ ভাবল। প্রতিভা যদি না ভাবে তো আরো একজন আছে অরুণের অভাবিত আবির্ভাবে অতিমাত্রায় চকিত ও বিস্মিত হয়ে ওঠার। কাজ নেই।

কিন্তু তথাপি অরুণ আঠারো নম্বরের ঘরের দিক থেকে সেদিন চোখ ফেরাতে পারল না। ভিতরে একটুকরো উঠোন দেখা যাচ্ছে। একটা ডুরে শাড়ি রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। প্রতিভার কি ওটা? প্রতিভার গায়ের রঙ, এমন কি ওর শরীরের মৃদু কোমল সৌরভটা পর্যন্ত ওই শাড়ির মধ্যে জড়িয়ে আছে, যেন দূর থেকে দাঁড়িয়ে অরুণ পরিষ্কার তা দেখল—অনুভব করল। তাই স্থির অনড় হয়ে আরো কতক্ষণ বলতে গেলে রাস্তার প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে ভাবছিল—যাব কি যাব না। একটা মোষের গাড়ি অরুণের গা ঘেঁষে চলে যাওয়ার পর তার খেয়াল হয়, এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে একটা ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকা অশোভন। হয়তো ওপাশে মুড়ির দোকানের

স্ত্রীলোকটি তা লক্ষ্য ক'রে এই কারণে মুখ টিপে হাসছে। কে জানে!

রাস্তায় আর দাঁড়াল না অরুণ। চিল্‌তে গলি অতিক্রম ক'রে সোজা সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। উঠোনে একটা রোগা ডিগ্‌ডিগে ছেলে দাঁড়িয়ে।

আশ্চর্য, অরুণ ছেলেটার মুখাকৃতি ও বয়স দেখে সুন্দরভাবে অনুমান ক'রে ফেলল —প্রতিভার সন্তান!

'তোমার মা ভিতরে আছেন?'

ভীত সন্ত্রস্ত দৃষ্টি অরুণের মুখের ওপর একবার বুলিয়ে ছেলেটি ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

দশ বছর। দাঁড়িয়ে অরুণ ভাবছিল, দশ বছর মানুষের জীবনে এক দীর্ঘ অধ্যায়। কত কি ঘটে, কত কিছু হারিয়ে যায়। পরিবর্তন আছে বলেই তো মানুষ বেঁচে থাকে, পরিবর্তন আসে বলেই তো সে আশা ছাড়ে না।

দু' মিনিট—চার মিনিট।

অরুণ একলা উঠোনের কোণে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল। ঘরের একটা জানালা দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওপাশে কদাকার একটা কাক বেসুরো ডেকে ডেকে আবহাওয়াটাকে আরো বিষণ্ণ ও এক-ঘেয়ে ক'রে তুলছে।

অরুণ, সবচেয়ে মজার কথা, তখনো ভাবছিল—দরকার নেই, কি হবে দেখা ক'রে! ফিরে যাব। এই জীর্ণ মলিন দারিদ্র্যের ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত একটা সংসার দেখতে আসার উদারতার মধ্যে যে হীনতা, অথবা বলা চলে কাপুরুষতার প্রলেপ লেগে আছে, তা আর কেউ না দেখুক, এতকাল পর এই দশ বছরের ব্যবধানেও প্রতিভার চোখে এড়াবে না, ভাবতে ভাবতে অরুণ আরো বেশি বিব্রত হয়ে পড়ল।

কাপুরুষ বলেই কি অফিস পালিয়ে ঠিক এই দুপুরবেলা সে এল

ওকে দেখতে! হয়তো এ সময়ে প্রতিভার স্বামী বাড়ি নেই, স্নান-খাওয়া সেরে দাওয়ায় বসে ও পান চিবুচ্ছে, শুয়ে থাকতে পারে, মেঝেয় বসে চালের কাঁকর বাছছে, কি যদি ইতিমধ্যে কাচ্চাবাচ্চায় ঘর ভরে যায়, নিজে লেখাপড়া-জানা মেয়ে হয়ে ওরা পাছে আকাট মূর্খ হয়, দুর্ভাবনায় সবগুলোকে দুপুরের অবসরটুকুতে বসে হয়তো অক্ষরজ্ঞান শেখাতে ব্যস্ত। এই গিয়ে দেখবে অরুণ। ছবি। অনেকরকম ছবি মনের পটে এঁকে এঁকে চুপিসারে আজ সে নারকেলডাঙ্গার বাসে চেপেছিল।

প্রতিভার সংসার দেখতে আসার দুর্দমনীয় বাসনার সঙ্গে অনিশ্চয়তার ছোটখাটো নানারকম দুর্ভাবনা যে ছিল না, তা-ও নয়।

আরো মিনিট দুই দাঁড়িয়ে রইল অরুণ।

ছেলেটা সেই যে ঘরে ঢুকেছে, আর বেরুচ্ছে না। প্রতিভা বাড়ি নেই? ঘুমোচ্ছে?

'কাকে চাই মশাই?'

ঘাড় ফিরিয়ে অরুণ চমকে উঠল। প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে বলল, 'আমি বেহালা থেকে এসেছি। আমার নাম শ্রীঅরুণ রায়।'

'তাই বলুন, প্রতিভার খোঁজে এসেছেন!'

বলে লোকটি আর অরুণের দিকে না তাকিয়ে একটা টিনের কৌটো থেকে বিড়ি বার ক'রে তা ধরাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বেশ কিছুক্ষণের নীরবতা।

ঘাড়ের ঘাম মুছতে পকেট থেকে গন্ধমাখা সুন্দর রুমালটা চট্ ক'রে বার করতে হঠাৎ অরুণের হাত উঠল না। অত্যধিক ছেঁড়া ময়লা লুঙ্গি—তেলচিটে তালিমারা একটা ফতুয়া গায়ে, অপরিচ্ছন্ন হাতের নখ, রুক্ষ চুল, নোংরা দাঁত বার ক'রে হেসে অরুণের আপাদমস্তক আর একবার লক্ষ্য ক'রে লোকটি বলল, 'বেহালার ছেলে বলতে ধরে ফেলেছি। তা আসুন-না। ওখানে

দাঁড়িয়ে থেকে আপনি ফিরে যাবার মতলব করছেন নাকি। এই কতক্ষণের মধ্যেই উনি এসে যাবেন। অদ্দুর থেকে এলেন, দেখা না ক'রে—'

অরুণ একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল।

এ আর অসম্ভব কি! স্বামী বাড়ি আছে, প্রতিভা বেরিয়েছে, ভাবতে গেলে এর মধ্যে অবাক হবার কিছুই নেই। প্রতিভা তো আর অসূর্যম্পশ্যা নয়। এ কাজ, সে কাজ—সংসারী মানুষ কত কিছুর জন্য তার বাইরে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া আজ দুপুরে অরুণ দেখা করতে আসছে, এমন কিছু তো আর আগে থাকতে সে সংবাদ পাঠায় নি।

অরুণ দাওয়ায় উঠতে লোকটি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল, 'পটলা, অ পটলা, বলি তুই কি সারাদিন আমার মাথা চিবিয়ে খাবি বলে তোর মা তোকে ঘরে রেখে চাকরি করতে বেরুলেন। আরে কুকুরের বাচ্চা, শিগ্‌গির একটা মোড়া নিয়ে আয়। মোড়া আছে? তা-ও নেই। একটুকরো খবরের কাগজ আন। ভদ্রলোককে বসতে দিবি না ছোটলোক!'

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পটলা ফ্যালফ্যাল চোখে অরুণকে দেখছিল। ধমক খেয়ে ভিতর থেকে একটা ছেঁড়া কাগজ এনে দাওয়ায় রাখল।

'বসুন, মসাই বসুন, শ্বশুরের দেশের লোক, খাতির-যত্ন করতে হয় বই কি! তা বেহালা আর নারকেলডাঙ্গা দুটো দেশ কেন, মহাদেশ বলতে পারেন। কত খরচা হ'ল ট্রামে! নাকি বাসে এসেছেন! অই একই কথা।'

কিছু না বলে অরুণ কাগজের ওপর আসন ক'রে বসল।

'হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আবার দেখছিস কি!' লোকটি আবার মুখ খিঁচিয়ে উঠতে চৌকাঠের পাশে দাঁড়ানো পটলা তাড়াতাড়ি চোখ নামালো।

'যা, শিগ্‌গির চারপয়সা চা আর কৈলাসের দোকান থেকে খান দুই বিস্কুট নিয়ে যায়। তোর মামা ইনি, বুঝলি! দুনিয়ায় এর চেয়ে বড় কুটুম নেই।'

লজ্জিত অপ্রস্তুত অরুণ, তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, চা কেন। এই দুপুরে চা খাওয়া আমার অভ্যেস নেই।'

বলতে লোকটি করুণ চোখে অরুণের দিকে তাকাল। 'ডাব খাবেন, সরবত? যা তো পটলা, বনমালীর দোকান থেকে বড় এক ভাঁড় লচ্ছি করিয়ে নিয়ে আয়। বলিস, তোর মা এলে দাম পাবে। আমার কাছে তো লবডঙ্কাও রেখে যায় না তোর জননী!'

বলে লোকটি নোংরা দাঁতে অরুণের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করল।

গম্ভীর হয়ে অরুণ বলল, 'আপনি খামকা ব্যস্ত হচ্ছেন। সরবত-টরবত কিস্‌সু দরকার নেই। আসুক-না প্রতিভা!'

'বুঝেছি, এইবার বুঝেছি, প্রতিভার হাতের দেওয়া জিনিস না হলে আপনি মুখে তুলবেন না।'

অরুণের মুখ কালো হয়ে গেল। দরদর ক'রে সর্বাঙ্গে আবার সে ঘামছিল।

'না, সে একটা কথা নয়। হ্যাঁ, ছোট বোনের মতই দেখতুম প্রতিভাকে। আমরা এক পাড়ায় ছিলুম তো! ছোটবেলায় একসঙ্গে কত খেলাধুলা করেছি।'

'আমি কি বলি না, আমিও রাতদিনই বলি পটলার মাকে— এই বাত-পিত্ত-কফ-অম্লের রুগীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোমার বাবা যে ভুল করলেন, তার আর তুলনা নেই। কত ভাল ভাল ছেলে ছিল তোমাদের বেহালায়; ভেবেচিন্তে কাজ না করলে এই দশা হয়। সত্যি, প্রতিভার জন্যে আমারই এক-একসময় কষ্ট হয়! অমন মাজাঘসা লেখাপড়া-জানা মেয়ে, দেখতেও তেমন একটা কালো-কুৎসিত না, কত সুখে ওর থাকবার কথা ছিল!'

অরুণ নীরব।

পটলা ফ্যালফ্যাল ক'রে আবার তাকিয়ে আছে। উঠোনে কাকেব বেসুরো ডাকটা এতক্ষণে থামল। নতুন বিড়ি ধরিয়ে পটলার বাবা বলল, 'তা যখন বিয়ে হয়, তখন অবিশ্যি আমিও ঠিক এমন, এতটা অকর্মা ছিলুম না মশাই, মোটামুটি ভাল চাকরি কবতুম। তা দেশের হালচাল যদি পাল্‌টায় তো আপনি কি কবতে পারেন, বলুন! অমন ডাকসাইটে দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক যদি হুমড়ি খেয়ে পডতে পাবে তো আমবা চুনোপুঁটিরা, আবে মশাই, আজো বেঁচে যে আছি, এই যথেষ্ট—কি কবার আছে বলুন? ব্যাঙ্কেব বাড়িখানা দেখেছেন তো লালদিঘীব পূবপারে! আকাশে গিয়ে ঠেকেছিল মাথা একদিন।'

অরুণ আস্তে মাথা নাড়ল।

'যাক্‌গে, প্রতিভা যে গুছিয়ে নিচ্ছে কোনবকমে, কপালেব ভাগ্যি। অন্যত্র চেষ্টা? আমার কথা বলছেন তো— ওদিকে ব্যাঙ্ক গেল, এদিকে ব্যারাম এসে বাসা বাঁধল শরীবে। পুবো দেড বছব আমবাতে নড়তে পারিনি মশাই! আড়াই বছব ভুগলাম অম্বলে, পেটে জল গেলে তাও এসিড হয়ে যেত। এখন অম্বল ভাল আছে, চারা দিয়েছে অর্শ। কাল সাবাবাত কী টাটানি গেছে মশাই! এই তো আপনি আসবাব আগে ঘুঁটে পুড়িয়ে সেঁক দিচ্ছিলাম। ধোঁয়ায় ঘরবাড়ি অন্ধকার হয়ে আছে, দেখছেন তো।'

'প্রভিভা কোথায় কাজ কবছে?'

'তা-ও আর এক ছ্যাঁচড়া কোম্পানি মশাই, স্কুলের টিচাবি ক'বে পেট চলে না বলে দুটো পয়সা বেশি পাবে আশায় ঢুকল, গোড়াতে একরকম রেগুলাব ছিল,—এখন তো ধরুন মাসের আজ আট তারিখ যায়,—মাইনে দেবার নাম নেই। কাল আরো পাঁচ টাকা কার কাছ থেকে ও হাওলাত ক'রে আনল তো রাত্রে হাঁড়ি চড়ল। ও কি আপনি উঠছেন নাকি?'

'না।' অরুণ একটু নড়ে বসল। সুন্দর রুমালটি বার ক'রে মুখ মুছতে এবার আর তার ততটা আটকায় না।

'হ্যাঁ, অরুণদা, অরুণদা, বহুদিনই শুনেছি প্রতিভার মুখে, অবিশ্যি আগে,—এদিকে কারো কথা আর শুনতাম না। তা কতক্ষণই বা আর ও ঘরে থাকে—ক'টা বা কথা হয়! পয়সার চিন্তায় চব্বিশ ঘণ্টা ওর থাকে মাথা গরম, আর আমি! আমার বুঝতেই পারছেন মানসিক অবস্থা! নামে ভর্তা, আসলে সবই চালাচ্ছেন স্ত্রী। খাওয়া-পরা থেকে আরম্ভ ক'রে মালিশের তেল, ইয়ে সেঁকবার ঘুঁটে—অ, আপনি বুঝি সিগারেট খান! দাঁড়ান, আনিয়ে দিচ্ছি। ওরে, যা তো মদনার দোকানে—কি কাঁচি, উইল্‌স, ক্যাপ্‌স্টান, —যা না, এক শলা ছুটে গিয়ে নিয়ে আয়, বলবি, সন্ধ্যাবাতির আগে পয়সা পাবে।' ছেলের দিকে তাকাচ্ছিল লোকটি।

বাইবে আকাশের দিকে মুখ ক'রে গম্ভীরভাবে অরুণ বলল, 'আমি সিগারেট খাই না। আপনি ব্যস্ত হবেন না।'

'হঠাৎ চেহাবা দেখে মনে হয়েছিল, আপনি বুঝি স্মোক করতে চাইছেন। না, আপনার চেয়ে যে খুব বেশি একটা বয়স হয়েছে আমার,—আমাব তা মনে হয় না। ব্যারামে ব্যারামে আর চিন্তায় চিন্তায় বুড়িয়ে গেলাম মশাই! তা অবশ্য স্মোকিং ছেড়ে দেওয়া ভাল। পয়সার সাশ্রয়, শরীরের ভাল। কম কষ্ট করতে হচ্ছে ওটি ছাড়তে আমাকে! হা ঈশ্বব! অবশ্য আমি বিশ্বাস করি, সব নেশাই ছাড়া যায়; ইচ্ছা থাকলে হ'ল,—মনেব জোব চাই,—হা—হা

প্রতিভাব স্বামী দাঁত বার ক'রে হাসতে লাগল।

অরুণের জলতৃষ্ণা পেয়েছিল। কিন্তু বলতে সে সাহস পাচ্ছিল না। 'জল' উচ্চারণ করতে না অতিথিবৎসল এই লোকটি আবার অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠে ডাব, সরবত, লিমনেডের জন্য হৈ-চৈ সুরু করে দেয়। অরুণ ভাবছিল—প্রতিভার কাছে না এসে যদি

সে এর কাছেই শুধু আসত, প্রতিভাকে না জেনে একে জানত, তবে কি সে এতটা সঙ্কুচিত হয়ে থাকত। ইচ্ছা করছিল তাঁর, তখনি উঠে পড়ে—ছুটে বেরিয়ে যায় রাস্তায়। আর একদিন, যখন প্রতিভা একলা বাড়ি থাকবে, তখন না হয় আসবে।

হঠাৎ ঠোঁট ও ভুরু কুঁচকে লোকটি কি একটা যন্ত্রণা চাপতে গিয়ে মুখখানাকে এমন বিকৃত ক'রে ফেলল যে, অরুণ ভয় পেল। কিছু প্রশ্ন করতে পারল না সে যদিও। যন্ত্রণাকাতর মুখ থেকেই উত্তর এল, 'শালা আবার টাটাচ্ছে,—আপনার জানাশোনা আছে কেউ? জলপড়া-শেকড়পড়া-জানা লোক? কি মাদুলি-ফাদুলি দেয়? বলছেন—বিশ্বাস? ঠেকলে বেড়ালের পা ধরতে হয়, জানেন তো! বড় বড় বিলাতী খেতাবধারী ডাক্তারকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না জীবনে! কিন্তু কি করব, শুনেছি--এসবে শেকড়-মাদুলি কাজ করে ভাল। আছে জানাশোনা?'

অরুণ মাথা নাড়ল। সদরের দিকে তাকাল সে। এল কি? ক'টা বাজে!

হ্যাঁ, প্রতিভা।

অরুণ চোখ ফেরাতে পারল না। টুকটুকে লাল একটা প্ল্যাস্টিকের ব্যাগ হাতে, এক হাতে একটা মাখনের কৌটো। কিন্তু সেগুলো হাতে রেখেই প্রতিভা দু হাত জড়ো করতে গিয়ে আর তা করল না। হাত নামাল।

পটলার বাবা হো হো ক'রে হেসে উঠল।

'তুমি কি ভাবছিলে, আমার বন্ধু? দি গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক ডুবেছে পর কোনো বন্ধু হতভাগাকে একদিন চুপি দিয়ে দেখতে এসেছে—দেখেছ কি আজ দু বচ্ছরে। তোমার,—তোমাদের বেহালার অরুণবাবু গো। আহা কি সুন্দর ছেলে, কি ভদ্র, কি অমায়িক!'

অরুণকে এবার প্রতিভার চিনতে কষ্ট হয় নি। কিন্তু স্বামীর

বকর বকর শুনে অরুণ যতটা অনুমান করল, প্রতিভার ভ্রূযুগল হঠাৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠল যেন। অবশ্য পর মুহূর্তে স্বচ্ছ হাসির আভায় সমস্ত মুখ উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠল প্রতিভার।

'অরুণদা! কতক্ষণ?'

'পুরু একটি ঘণ্টা। তবু তো আমি কথা কয়ে কয়ে ধরে রেখেছি। বাড়িতে আর কেউ না থাকলে কি তিনি এতটা সময় অপেক্ষা করতেন!' কথা শেষ ক'রে পটলের বাবা আবার শব্দ ক'রে হাসল। 'শালা নর্দমার গন্ধে কোনো ভদ্রলোক এখানে এতক্ষণ বসতে পারেন—এ একেবারে আশাতীত।'

এক মুহূর্তের জন্য প্রতিভা ও অরুণের দৃষ্টি বিনিময় হল। প্রতিভার পরনে কালো পাড় একটা ফর্সা শাড়ি। ব্লাউসটার রং ওর হাতের ব্যাগের মতই কড়া লাল। কপালে নাকের পাশে মুক্তার মত ঘামের বিন্দু। 'আমি ভাবতেই পারি নি, তুমি কোনোদিন নারকেলডাঙ্গার বস্তিতে এসে উঁকি দেবে। তারপর? খবর কি! শুনেছি, চাকরি-বাকরি করছ। বিয়ে?'

অরুণ নীরব থেকে মাথা নাড়ল।

'ছেলেমেয়ে?'

'একটি।' অরুণ প্রতিভার চোখে চোখ রাখল। 'তুমি কাপড়চোপড় ছেড়ে—'

'সেজন্যে ব্যস্ত হতে হবে না।' প্রতিভা একটা ছোট নিশ্বাস ফেলল। 'এখুনি আমাকে বেরোতে হবে।'

'অ, তুমি বুঝি আজই মল্লিকবাবুর সঙ্গে দেখা করবে! হ্যাঁ, শুনেছি, সন্ধ্যার দিকে তিনি বাড়িতে থাকেন। হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে দেখা করলে আমার যতদূর বিশ্বাস, একটা সুবিধা ক'রে দিতে পারেন। তাঁর ওষুধের কারখানায় বিস্তর মেয়ে এমপ্লয়িজ নেওয়া হচ্ছে। কাদাপাড়ায় থাকেন না তিনি? খুব ভদ্র!'

স্বামীর দিকে তাকাল না প্রতিভা। গম্ভীর হয়ে বলল, 'না,

সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে থাকেন· তিনি এ খবর তোমায় কে দিলে।
ফিরতে তাঁর রাত দশটা এগারোটা বাজে। সেখানে না। আমার নিজের একটু অন্য কাজ আছে।'

প্রতিভার স্বামী, অরুণ লক্ষ্য করল, যেন সাহস পেল না স্ত্রীকে এ সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করতে। অরুণের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতিভা আবার স্নিগ্ধ হাসল। 'একটু চা-টা খাবে কি ?'

'না।' অরুণ পটলের বাবার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ নত করল।

'তা'লে চল, বাইরে বেরিয়ে বাস স্টপেজে যেতে যেতে তোমার সঙ্গে দুটো একটা কথা বলি। আমি ভাবতেই পারি নি, তুমি আমাকে মনে ক'রে রেখেছো। পটলা, এগুলো ধর তো বাবা।'

পটলা চৌকাঠ পার হয়ে ছুটে এসে মার হাত থেকে মাখনের কৌটো আর ব্যাগ নিতে যাচ্ছিল। কি ভেবে প্রতিভা বলল, 'থাক, ব্যাগ রেখে গেলে চলবে না। এটা ঘবে রেখে দাও।'

সুন্দর লেবেল-আঁটা চক্‌চকে মাখনেব টিনটা হাতে নিয়ে পটল আগ্রহে নেড়েচেড়ে দেখছিল।

'ওটা কিন্তু এখুনি আবার খুলে ফেলিস না হারামজাদা! তোর মার জন্যে। সারাদিন কি খাটুনি যায়! পেটে কি আর ভাল জিনিস পড়ে! কাঁচামুগ ডাল আর কুমড়োর ঘণ্ট খেয়ে শরীর টেঁকে না।'

'না, না, তোমার জন্যে।' প্রতিভা ব্যস্ত হয়ে বলল, 'পাইল্‌স্‌-এ ভুগছ। অফিসের একজন আমাকে বলল, মাখনটা তোমার পক্ষে ভাল।'

'আমার জন্যে! কত দাম পড়েছে, কোন্ কোম্পানির মাখন ?' অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে প্রতিভার স্বামী টিনটা ছেলের হাত থেকে কেড়ে নেয়।

'গায়ে লেখা আছে, দেখলেই বুঝতে পারবে।' প্রতিভা স্বামীর দিকে এবারও তাকাল না। 'চল, অরুণদা।'

অরুণ উঠে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল।

প্রতিভার স্বামী মাখনের কৌটো হাতে নিয়ে যখন নেড়েচেড়ে দেখছিল, অরুণকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিভা বস্তির সদর পার হয়ে রাস্তায় নামল।

'বৌ দেখতে সুন্দর ?'

'তোমার চেয়ে না।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'সত্যি। রং ফর্সা। কিন্তু তোমার লাবণ্য ওর মধ্যে নেই।'

প্রতিভা চুপ।

অরুণ বলল, 'কোনদিকে তুমি যাবে ?'

'কোথাও না।'

'তার অর্থ ! বললে, কি কাজ আছে না তোমার ?'

'কাল যাব। কাল গেলেও চলবে।' প্রতিভা অল্প শব্দ ক'রে হেসে অরুণের দিকে বাঁকা চোখে তাকাল। 'চল, ওই মাঠে—জায়গাটা নিরিবিলি।'

'কিন্তু আমার ভয়ানক চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।' অরুণ ঢোক গিলল। 'ওই যে একটা রেস্টুরেণ্ট না ?'

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে ! পাড়ার দোকান। তোমায় নিয়ে বসে চা খেলে এখুনি কেউ না কেউ গিয়ে বাড়িতে রিপোর্ট করবে।' প্রতিভা এবার হাসল না।

অরুণ দমে গেল।

'কেন, বাড়িতে বললে না কেন ? আমাদের কি চায়ের সরঞ্জাম নেই। ও খায় না অসুখ বলে, আমাকে চা খেতে হয়।'

'এই মাত্র কাজ থেকে ফিরলে— ক্লান্ত তুমি, এখুনি আবার

চায়ের কারখানা জুড়বে, ইচ্ছা ক'রে বলি নি। তা ছাড়া, তুমি কি আমায় শুধু চা খাইয়ে ছাড়তে!'

প্রতিভা কথা বলল না।

'যদি বেড়াতেই হয়, মাঠে গিয়ে লাভ কি! চল, শহরের দিকে যাওয়া যাক। একটা রেস্টুরেণ্টে চা খাব দুজনে।' অরুণ প্রস্তাব করল। 'নাকি সেখানেও তোমার ভয়?'

প্রতিভা বলল, 'ঠাট্টা করছ!'

'না, তা না।' অরুণ দুঃখিত হ'ল। 'বলছিলাম এমনি, সত্যি।'

প্রতিভা কথা বলল না, তার ছোট্ট নিশ্বাস শোনা গেল। একটা বাস এসে গেছে। অরুণ হাত তুলতে গাড়ি দাঁড়ায়। দুজনে উঠে পড়ে।

বাসে এক সিটে বসা হয় না ভিড় বলে।

অরুণ এক পায়ের ওপর কোনরকমে দাঁড়িয়ে থেকেই দুখানা টিকিট কাটল।

ধরমতলার কাছাকাছি এক জায়গায় বাস দাঁড়াতে প্রতিভার হাত ধরে সে নেমে পড়ল।

'এদিকে।'

প্রতিভা ডান দিকে ঘুরছিল। অরুণ ওর হাত ধরে বাঁ দিকের পেভ্‌মেণ্টে উঠে ছোটখাটো সাজানো একটা রেস্টুরেণ্টে ঢুকল। মেয়েদের নিয়ে বসে নিরিবিলি চা খেতে এখানেও পর্দা-ঘেরা ছোট ছোট কামরার ব্যবস্থা আছে। অরুণ ও প্রতিভা একটাতে ঢুকল।

অরুণ চা এবং কিছু খাবার আনতে বলে দিয়ে প্রতিভার হাতে হাত রেখে বলল, 'বলো, কেমন আছ।'

'চোখে তো দেখে এলে!'

'পটলের বাবা লোক ভাল মনে হয়, খুব সব্‌মিসিভ।'

'ঠেকলে কে তা না হয়, বলো।' শুকনো গলায় প্রতিভা বলল,

'যখন শরীর ভাল ছিল—যখন চাকরি ছিল, বীরবিক্রম সিংহরাজ ছিল।'

অরুণ চুপ।

প্রতিভা বলল, 'আমাদের বেহালার সুধাংশুকে মনে আছে তোমার?'

'হ্যাঁ, কেন থাকবে না।' অরুণ একটা সিগারেট ধরাল। 'ও তো কলকাতায় নেই।'

'না। এলাহাবাদে চাকরি করছে।'

অরুণ প্রতিভার চোখের ভিতর তাকাল।

'তখন বস্তিতে ছিলাম না। বৌবাজার নেবুতলায় বাসা আমাদের, মানে ওর চাকরি থাকা অবস্থায়।'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'একদিন, একদিন ঠিক না, দু-তিনদিন সুধাংশু আমার কাছে গিয়েছিল।'

'তারপর?'

'খুব অপমান করল পটলের বাবা। বিয়ের আগের খাতির এখন ফলানো চলবে না! আমি যদি মরি, আবার যদি প্রতিভা বেহালায় ফিরে যায়, তখন না হয় রাতদিন আড্ডা দেবেন মশাই, এর আগে দয়া ক'রে এখানে আনাগোনা বন্ধ রাখুন।'

'সুধাংশু খুব দুঃখিত হয়েছিল?'

'তা বুঝতেই পার।' প্রতিভা অরুণের দিকে না তাকিয়ে চায়ের জলে দুধচিনি মেশালো।

'তারপর আর সুধাংশু যায়নি নিশ্চয়।'

প্রতিভা মাথা নাড়ল।

'আমার সঙ্গে, যতক্ষণ ছিলাম, খুব ভাল ব্যবহার করলেন।'

'ক্রিপল্‌ড্‌ হয়ে পড়লে মানুষ তাই করে।'

অরুণ একটু পুডিং ভেঙ্গে মুখে পুরল।

‘এবার তোমার খবর বলো, কেমন কাটছে জীবন ?’

‘ভাল।’ অরুণ বলল, ‘আমি খুবই ভাল আছি এদিক থেকে, প্রতিভা। মীরার শীত-গ্রীষ্ম বোধ নেই। শাড়ি-গয়না পরতে পারলে দুনিয়ায় আর কিছু চায় না।’

‘খুব শাড়ি গয়না পরাচ্ছো বৌকে !’

‘না, খুব আর কি। চা খাও, তোমার চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।’

প্রতিভা নিঃশব্দে চায়ের বাটিতে মুখ নামাল।

একটু পরে ও চোখ তুলল।

‘কত পাচ্ছ এখন ? কিছু মনে ক’রো না, এমনি জিজ্ঞেস করছি।’

‘বা রে, মনে করার কি আছে ! কেন জিজ্ঞেস করবে না। এলাওয়েন্স-ফেলাওয়েন্স নিয়ে পাঁচশ’র মতন হয়।’

প্রতিভা এবার সিলিং দেখল।

‘শাড়ি-গয়না পেলেই বুঝি মীরাদেবী সুখী ! আর কিছু চান না ?’ অরুণের চোখে চোখ রেখে প্রতিভা অল্প হাসল।

‘অনেকটা তাই।’ অরুণ হাসল।

‘আজ আমার সঙ্গে বসে চা খেয়েছ, এতটা সময় গল্প কবছ শুনলে কিছু বলবেন না ?’

অরুণ মাথা নাড়ল।

‘তোমার বৌকে একদিন দেখতে যাব।’ প্রতিভা বলল।

‘যেও। সত্যি যাবে ?’ অরুণ সিগারেটের টুকরোটা ছাই-দানিতে রাখল।

‘ভাল কথা, বলতে ভুলে গেছি, আমি এখন বেহালায় নেই।’

‘কলকাতায় বাসা করেছ বুঝি বৌকে নিয়ে ?’

অরুণ মাথা নাড়ল।

‘কেন যাব না ! তোমার বৌ যদি কিছু মনে না করেন, যেতে দোষ কি, কি বল ?’

‘কবে যাবে ?’ অরুণ প্রতিভার হাতে হাত রাখল।

'যাব একদিন। তুমি' --প্রতিভা থামল।

'কি ?'

'নাঃ, ওঠ এইবেলা, আমার আবার রান্নাবান্না আছে।'

'তা-ও বটে। সত্যি, তুমি যদি একটা ভাল কাজটাজ পেতে।' অরুণ লম্বা নিশ্বাস ফেলল।

'চেষ্টা করছি, হচ্ছে না। একটু বেশি টাকা পেলে একটা লোক-টোক রাখা যেত। সারাদিন খেটেখুটে গিয়ে আবার ওসব কাজে হাত লাগাতে ইচ্ছা করে কি! তোমার জানাশোনা কোনো কন্‌সার্ন—বা তোমাদেব অফিস? তোমাদের ওখানে মেয়ে এম্‌প্লয়িজ নেই ?'

অরুণ মাথা নাড়ল।

'আছে, একটি। টেলিফোন বোর্ডের জন্যে একজন মেমসাহেব রাখা হয়েছে শুধু।'

'ডাকো বয়কে। বিল্ চুকিয়ে এবার বেরোনো যাক।' প্রতিভা দেয়ালে একটা আয়না দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ঠিক করল।

বয় এল। অরুণ পার্স খুলে দাম মিটিয়ে দিল। তারপর প্রতিভার হাত ধরে রাস্তায় নামল। সামনের স্টপেজে না দাঁড়িয়ে দুজনে আর একটু হাঁটল।

'চলি এইবেলা।' দূরে গাড়ি দেখে প্রতিভা দাঁড়ায়।

'তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে খুব, না ?' অরুণ প্রতিভার হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ায়।

'যেও আব একদিন।' প্রতিভা বলল।

'উনি কিছু মনে কববেন না তো।' অরুণ ইতস্তত না ক'রে প্রশ্ন করল।

'তা করলেই আর কতটুকুন করবেন! বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে, বললাম তো।' প্রতিভা শুকনো হাসল। বাস এসে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ির পা-দানিতে পা রাখতে রাখতে প্রতিভা বলল, 'তোমার বৌকে একদিন দেখতে যাব কিন্তু। বাসার ঠিকানা কি ?'

'যাবে কি তুমি ? যাবে না।' যেন হঠাৎ বিশ্বাস করতে পারছে না, এভাবে হাসল অরুণ। 'কবে যাচ্ছো ?'

'যাব একদিন অবসর মতন। ঠিকানা ?'

'তুমি যাবে না। বাড়িতে রুগী, ছেলে—এদিকে চাকরি, রান্না-বান্না, বাজার করা—তোমার যে কোনোদিন অবসর হবে, তাই আমার মনে হয় না।'

'তা হলেও চেষ্টা করব, বলো।' প্রতিভা ব্যগ্র হয়ে জানলার বাইরে মুখ বাড়ালো। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। 'রাস্তার নাম কি, কত নম্বর ?'

আশ্চর্য, গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে দেখেই যেন অরুণ আরো বেশি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে হেসে মাথা নাড়তে লাগল। 'তুমি যাবে না—'

'আশ্চর্য, বাড়ির ঠিকানাটা দিতেও সাহস হচ্ছে না তোমার, অরুণ !' হতাশ করুণ গলায় প্রতিভা কথাগুলো বলল কি বলল না, অরুণ ঠিক বুঝল না। যখন চোখ তুলল, গাড়ি দূরে চলে গেছে। রাস্তা প্রায় ফাঁকা। একটা রিক্সা ওপারে দাঁড়িয়ে আছে।

বুটকি ছুটকি

বুটকি আর ছুটকি। দুই বোন।

প্রতাপ কম্পোজিটারের মেয়ে। বুটকি বড় ছুটকি ছোট। তাও বেশি না, বছর তের মাসের ব্যবধান। দেখতে দেখতে ওরা কত বড় হয়ে গেল।

বস্তুত, বৌবাজারের 'কুলদাকুণ্ডলিনী প্রেসে'র কম্পোজিটার প্রতাপ দাস নামক কোন ব্যক্তি ঘনশ্যাম কবিরাজ লেনের ন'নম্বর বাড়ির পিছনের দিকের একটা অন্ধকার মতন ঘরে আজ আঠারো বছর বাস করছে। যদি তা কারোর জানবার, মনে রাখবার উৎসাহ বা আগ্রহ থাকে তবে বুটকি ছুটকির দৌলতে হয়েছে বুঝতে হবে।

হ্যাঁ, ভীষণ মিষ্টি চেহারা দুটোরই। বুটকিটা ইদানিং একটু মোটা হয়ে পড়েছে। ছুটকিটা এখনো তেমনি। যেন খ্যাংরা কাঠি! কেবল মাথায় লম্বা। কেবল হওয়ার মধ্যে হয়েছে এক মাথা চুল। সরু ঘাড়ে অতবড় খোঁপাটা মানায় না, বেণী করে ছেড়ে দিয়েও সুখ নেই। লিক্‌লিকে সাপ হয়ে দু'টো হাঁটুর কাছে নেমে মাথা ঠোকাঠুকি করে। ছুটকি অনেক দুঃখে খোঁপার আঁটি মাথায় নিয়েছে। পরনে ফ্রক।

কখনো বা বড় বোন বুটকির শাড়ি সায়া ব্লাউস পরে। বুটকি তখন ফ্রকটা পরে। ধোয়া-মোছার কাজ করে। দিনের বেলা প্রায় সবটা সময়ই বুটকিকে ফ্রক পরে কালিঝুলি জল মশলার দাগের সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তারপর নিজের শাড়ি ব্লাউস কেড়ে নেয়।

ছুটকির ঝাড় পোছ করা গুছিয়ে রাখার হাল্কা টুকিটাকি কাজ। সে-সব কখন সেরে ফেলে শাড়ির আঁচল ঘুরিয়ে শিস দিয়ে

বেড়াচ্ছিল। ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে গেল। মুখভার করে শাড়িখানা ছেড়ে দিদির হাত থেকে ফ্রকটা তুলে নেয়। এখন তার ভারি কাজের পালা। উনুন ধরানো চা করা রুটি বা ভাত যা হোক কিছু সিদ্ধ করতে হয়। তারপর সব আবার মাজা আর ধোয়া। কলতলায় বসে। রাত এগারোটা পর্যন্ত।

মা নেই, সংসারের কাজ ভাগ করে নিয়েছে দু'বোন। সন্ধ্যাবাতি জ্বেলে বাবার ফাইফরমাস খাটা ও হাতের কাছে এটা ওটা বাড়িয়ে দেওয়ার হাল্কা কাজটুকু হাতে পেয়ে বুট্কি এখন সন্তুষ্ট। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার পর সে এক পোছ আলতা দিয়েছে পায়ে। পাউডার মেখেছে। কাজল বুলিয়েছে চোখে।

ঘরে পাখা নেই। একটা হাতপাখা হাতে করে বুটকি প্রতাপের শিয়রের কাছে দাঁড়ায়। ক্যানভাসেব ওপর মাথা রেখে ইজিচেয়ারে শুয়ে প্রতাপ বিশ্রাম করে, চা খায়।

প্রতাপ আবার তখনি বেরিয়ে যায়। পাড়ার কাছাকাছি আর একটা হিন্দী প্রেসে চার ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজ নিয়েছে।

ক'টা বেশি টাকা রোজগার করতে 'কুলদাকুণ্ডলিনী প্রেসে'র ছুটির পর 'মহাবীর প্রেসে'র এক্সট্রা কাজটা অনেক দিন ঘোরাঘুরি করে তবে প্রতাপ সম্প্রতি যোগাড় করতে পেরেছে।

দু'বোন আবার একলা হয় তখন।

বাড়িটাও এমনি যে আটটা ন'টা বাজতে ওপরের ঘরগুলোর বাতি নিভে যায়। চাকুরে লোক বলে সকলেরই সকাল সকাল খাওয়া ও একটু বেশি সময় শরীর মন বিশ্রাম পাবে বলে সঙ্গে সঙ্গেই আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়া। সেই নির্জনতায় নিজেদের একতলা ঘরের ছোট্ট বারান্দা আর কলতলা নিয়ে বুটকি ছুটকি রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত জেগে থাকে। কোনদিন রাত একটা বাজে।

প্রতাপ আর একটু বেশি কাজ করে হয়তো সেই রাত্রে। বুটকি ছুটকি চুপচাপ রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে সামনের গলিটা দেখে। বাড়িটা

ভিতরের দিকে বলে রাস্তার সামান্য অংশমাত্র চোখে পড়ে। এই বুঝি একজন ফেরিওয়ালা চলে গেল, একটা রিক্সা যাচ্ছে, পিছনে করপোরেশনের ময়লা ফেলার ঠেলা, টেলিগ্রাফ-পিওন কি না কাগজের অফিসের পিওন চেহারাটা ভাল ক'রে দেখতে না দেখতে সাইকেলটা হয়তো চোখের আড়ালে চলে গেল।

বুটকি ছুটকি রাস্তার খুব বেশিটা দেখতে পায় না।

গলি থেকে বেরিয়ে আসা একটা কানাগলি চলে এসেছে এ বাড়ির দিকে। সেই ফাঁকটুকু দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে যা দেখা।

না, আগে যেত ওরা, সারাদিন বাইরের গলি মানে ঘনশ্যাম কবিরাজ লেনের সবটা দু'বোন এ-মাথা ও-মাথা চষে বেড়িয়েছে। দু'বছর আগেও।

কানাই দরজির দোকান। রাসু ময়রার জিলিপি গজার দোকান। দশরথের ডাইংক্লিনিং, নন্দীদের ইলেক্ট্রিকের দোকান। বড় রাস্তার সঙ্গে গলিটা যেখানটায় মিশেছে। জায়গাটায় আলো বেশি, ইলেক্ট্রিকের খুঁটিটা সেখানেই দাঁড় করানো আছে বলে। ধূপকাঠি আর চানাচুরওয়ালা বুকে ডালা ঝুলিয়ে অনেক রাত অবধি সেখানে দাঁড়িয়ে খদ্দের ডাকে। গাছের ডালের মত চারটে বাঁকানো লোহার মাথায় আলোর ডোম পরে খুঁটিটা সারারাত জাগে। যখন রাস্তায় আর কেউ থাকে না চারটে ডোম নিয়ে খুঁটিটা যেন একলা দাঁড়িয়ে রাস্তা পাহারা দিচ্ছে মনে হয়। ছবিটা বুটকি ছুটকি এত বেশি দেখেছে যে তা যেন এখনো চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে দু'জনের। কানাগলির চৌহদ্দী ডিঙ্গিয়ে রাস্তায় যাওয়া ওরা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। আরো অনেক আগেই অবশ্য দেওয়া উচিত ছিল।

কিন্তু করে কি! মা মরে গিয়েই তো হঠাৎ বিপদ হ'ল চারদিকে। ইদানিং ওরা রাস্তায় বেরোত, কিন্তু দিনের বেলায়, বিকেলে বা সন্ধ্যার দিকে একেবারেই যেত না।

ভোরের দিকে একটু হাওয়া খেতো দু'বোন। কানাগলি ছেড়ে গলিতে। গলি ধরে বড় রাস্তার দিকে, যেখানে আলোর খুঁটিটা। ভোরের হিমেল হাওয়ায় হাই তুলে তুলে একটা ট্রাম আলস্য ভাঙ্গার চেষ্টায় সবে ছুটতে শুরু করেছে। দেখে দু'বোন খুব খানিকটা খিলখিল হেসে নিয়ে আবার তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে।

আসবার সময় রাস্তার দু'ধারের সবগুলো দোকানের সাইন-বোর্ডের মুখস্থ করা নামের ওপর চকিতে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে।

লাভ নেই, কারণ ছিল না।

তবু ছোটবেলা থেকে ওরা এই গলির মধ্যে থেকে বড় হয়েছে।

প্রত্যেকটা দোকানের ছেলে-বুড়ো ওদের চেনে। ছুটকি বুটকি। প্রতাপ কম্পোজিটারের মেয়ে। কি ফুট্‌ফুটে চেহারা হয়েছে দু'টোর ত্থাখ্।

বস্তুত, দু'ধারের দোকানের সবাই ডেকে আদর করে বুটকি ছুটকির হাতে তুলে দিয়েছে লজেন্স, বিস্কুট, খালি টিনের বাক্স, ফাটা পুতুল, বাক্স-বন্দী থেকে রং চটে গেছে এমন সব রিবন, কাঁটা, এক-আধ জোড়া কাঁচের চুড়ি।

আর দরজি দিয়েছে মেশিনের তলায় গাদা হয়ে থাকা হাজার রঙের ছিটের টুকরো, সিল্কের টুকরো। এখনো সে-সবের তৈরী জামাকাপড়ে ঘর বোঝাই হয়ে আছে।

বুটকি ছুটকি পুতুল খেলার বয়স বেশ কিছুদিন হ'ল পার হয়েছে। এমনকি, খুব বেশিদিনের কথা না যদিও, দু'বোন লোভ করে একদিন মদন হালুইয়ের দোকানে ঢুকে পড়েছিল। বেশি পয়সা ছিল না সঙ্গে। একটা দু'আনি সম্বল। ওই পেয়ে মদন খুশি হয়ে দু'জনকে দোকানের পিছনে একটা চৌকির ওপর বসিয়ে অমৃতি, গজা, রাজভোগ এবং একটা ক'রে লেডিকিনি খেতে দেয়। মাত্র দু'আনায় মদনকে এতগুলো খাবার প্লেটে তুলে দিতে দেখে লজ্জায় দু'বোনের গাল লাল হয়ে ওঠে। খাবে কি, মুখ খুলছিল না কেউ।

হেসে মদন (যেন কাজটা করতে গিয়ে নিজেও লজ্জিত) বলল, 'তা, লজ্জার কি, না-হয় দিলামই খেতে, আমারইতো দোকান। আগে কত জিলিপি আর গজার ভাঙ্গা টুকরো খেতে সেই ভোর না হতে দোকানে চলে আসতিস, মনে নেই। খা– খা—'

মদন ছুটে গিয়ে গ্লাসে করে জল নিয়ে আসে।

যেন লজ্জাটাকে বেরোতে না দিয়ে দু'বোন মুখ নিচু করে একসঙ্গে সবগুলো খাবার মুখে ঠেসে এবং কিছু ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মুখ ধুয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মশলার থালা নিয়ে ছুটে গিয়েছিল মদন পিছু পিছু দরজা পর্যন্ত। 'এই বুটকি ছুটকি! বাপরে, কী চমৎকার চেহারাই না হয়েছে ছুঁড়ি দু'টোর! তা আসবি মাঝে মাঝে বেড়াতে। এখন এমন ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি তোরা! আসবি, আর একদিন, চলে আসিস।'

মদনের কথা শুনে পাশের ইলেক্‌ট্রিকের দোকানের মানিক চিৎকার করে ডাকছিল। শুনে বুটকি ছুটকির মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। 'তোদের দু'বোনকে দু'টো টেবিল-ল্যাম্প উপহার দেব বলে আজ কতদিন আমি রাস্তার দিকে চেয়ে আছি। কী ব্যাপার শুনি? মানিকদা'কে আর মনে নেই? হঠাৎ এমন? কি, ভাঙ্গা আর মরা বাল্‌বগুলো নিতে ছুটিতে রাত আটটা অবধি দোকানে ঘুর ঘুর করতিস, এরি মধ্যে ভুলে গেলি? তোদের পুতুলের বিয়ের রাতের আলো আর জ্বলছে না বুঝি?'

মানিক মনে খুব একটা কষ্ট নিয়ে কথাটা বলছিল টের পেয়ে বুটকি ছুটকি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

'লম্বা লম্বা ফ্রক পরছিস এখন থেকে,' মানিক কিছুটা অবাক কিছুটা খুশি হয়ে দু'বোনকে দেখছিল। চৌদ্দ পনেরো। এক বছরেই শরীরের কী পরিবর্তন হতে সুরু করেছে। বুটকির কোমরের দিকটা সুন্দর। ছুটকির বুকের দিকটা। দু'জনের ওপরই একসঙ্গে চোখ রেখে রুদ্ধশ্বাস মানিক মুখের কথা বন্ধ রেখে

দাঁড়িয়ে রইল। আর ঝাকড়া চুল নেই। দু'জনের পিঠ বেয়ে সাপের মত লম্বা দুই বেণী। দো'পাটির মত একটি করে লাল ফিতে অর্থাৎ রিবন বাঁধা হয়েছে ক'ষে সাপ দু'টোর গলায়।

তা মানিকের চেহারাও এই দেড় বছরে অনেক বদলে গেছে। গাল দু'টো বেশ ফুলোফুলো হয়েছে। যেন গোঁফ উঠতে সুরু করছিল ইদানিং। এখন কামানো হচ্ছে। আগে গলায় একটা লাল রুমাল বেঁধে রাখত ও সারাক্ষণ! এখন আর গলায় রুমাল নেই। বুক পকেটে মিহি আদ্দির নিচে রুমালের সুন্দর বেগুনী কোণাটা উঁকি দিচ্ছিল।

আগে দোকানে মানিক সিগারেট খেতো না। এখন দেখে দু'বোনই বুঝল দোকানে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে মানিক সিগারেট খাচ্ছিল। আঙ্গুলে এতবড় একটা আংটি। দেখে দু'বোন চমকে উঠল। পরিবর্তনটা গুরুতর রকমের হয়েছে। বিয়ে করেছে তার চিহ্ন।

'আর বেরোস না কেন?'

'বাবা নিষেধ করে।'

একটা ঢোক গিলল ইলেক্‌ট্রিকের দোকানের স্বত্বাধিকারীর ছেলে মানিক নাগ।

'হ্যাঁ তাতো করবেনই, বড় হয়েছিস।' মানিক সিগারেটটায় আবার একটা টান দিল।

'চলি।' বুটকি কথা ফুরিয়েছে দেখে ঘাড় নাড়ল। ছুটকি মাথা তুলে বলল, 'তা ছাড়া মার অসুখ। সব সময় ঘরের কাজকর্ম করতে হয়।'

'হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে।' মানিক মাথা নাড়ল, 'তোর মা অনেকদিন থেকে ভুগছে?'

'হ্যাঁ, তা তো ভুগছেই, দু'বার প্লুরিসি হয়ে গেল। শরীর সারছে না।'

'সম্ভবত টি বি হবে।'

মানিকদা'র মন্তব্য শুনে দু'বোন কথা বলল না, হ্যাঁ তা তো হয়েছেই। তা আর তাকে জানতে দিয়ে কি হবে।

'চলি।' বলল দু'বোন।

'টেবিল-ল্যাম্প?' মানিক ল্যাম্প দু'টো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ছুটকি মাথা নেড়ে বলল, 'আমরা আর পড়ি না। ইস্কুলে নাম কাটা গেছে। টেবিল-ল্যাম্প নিয়ে কি হবে!'

'এমনিও জ্বালাতে পারবো না। গেল মাসে ইলেক্‌ট্রিকের লাইন কেটে দিয়েছে।' বুটকি লুব্ধ চোখে সুন্দর বাতি দুটো দেখে।

তারপর দু'বোন হাত ধরাধরি ক'রে রাস্তা পার হ'য়ে কানাগলির মধ্যে ঢুকে পড়ে।

মানিক চোখ সরায় না।

এবং মানিকের মত খোকন দর্জি, মনোহারী দোকানের হারাণ, লজেন্স-বিস্কুটের দোকানেব তারাচাঁদও যে মুঠ মুঠ করে উপহার দিতে চেয়েছিল। কেউ কিছু আনে নি। দু'বছর আগের কথা। তারপর তো বুটকি ছুটকির মাথাব ওপর দিয়ে কত ঝড় বয়ে গেল।

মা মবল। প্রতাপেব পা কাটা গেল ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে, চাকার সঙ্গে আটকে। হাসপাতালে আট মাস শুয়ে থেকে তারপর কাঠের পা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এল। খবরের কাগজের অফিসের চাকরিতে নাইট ডিউটি। খাটা দুঃসাধ্য। চাকরি ছেড়ে দিয়ে দিনের বেলায় ছোটখাটো পাব্‌লিশার 'কুলদা কুণ্ডলিনী প্রেসে'র চাকরি নিতে হয়। মাইনে এত কম যে অরিরিক্ত কাজ চাই। সেটা আপাতত জুটল।

আর দু'বছরে দু'বোন বেশ বড় হয়ে গেল। চৌদ্দ পনেরো থেকে ষোল সতেরোয়। বুটকি বেঁটে, ফ্রক পরলে ততটা খারাপ

দেখায় না, কিন্তু ছুটকির পা হু'টো এত লম্বা হ'য়ে গেছে যে হাঁটুর ওপর বেশ খানিকটা জায়গা খালি থাকে ওটা পরার পরেও।

এবং অদূর ভবিষ্যতে যে ছুটকির ফ্রকপরা শেষ হবে সে-আশাও ও করতে পারছিল না। তাই এখন দিদির শাড়ি দিদিকে ফিরিয়ে দিয়ে বেশ মন খারাপ করেই রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গলির ফাঁকটা দেখছিল।

'সামনের মাসে সম্ভবত দেনাগুলো শেষ হয়ে যাবে।' পিছনে দাঁড়িয়ে বুটকি ছোট বোনকে প্রবোধ দিচ্ছিল। 'আমি বলব বাবাকে তোর শাড়ি কিনে দিতে।'

'তোরও তো লাগবে। তোর হু'টো কাপড়ই ছিঁড়ে উঠেছে।' ছুটকি বুটকির গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। 'আর শুধু শাড়িতেই বা কি হবে। শায়া চাই ব্লাউজ একটা অন্তত, কাঁচুলি ফাচুলি কিছু না হলে আর পারা যায় না।'

অন্ধকারে বুটকি মাথা নাড়ল।

প্রতাপ না ফেরা তক খামকা আর আলোটা জ্বালে না ওরা। অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে হু'বোন গলির ফাঁকটা দেখে, কখনো কথা বলে। যখন কথা বলে না, চৌবাচ্চার জল পড়ার শব্দটা কানে বাজে। আর কোন শব্দ নেই এদিকটায়।

কানাগলির সবটাই অন্ধকার। আর অতিমাত্রায় নির্জন। সবগুলি বাড়ির পিছন নিয়ে এই গলি। মেথর যাতায়াত করে আর করে সবচেয়ে কম ভাড়াটের প্রতাপ কম্পোজিটার। ক্লাচ পরে ও যখন খুট্ খুট্ করে বড় গলিতে গিয়ে ওঠে, তখন একটা লঘু শব্দ হয়। সম্ভবত নিচের পাথরগুলোর তলায় কিছু নেই বলে ফাঁপা শব্দটা ডবল হয়ে ওপরে উঠে যায়, আর তখন ওপরের জানালাগুলো এক আধবার খোলা হয়। কেউ কেউ আবার রেডিওর জন্য শব্দ শুনতে পায় না বলে নিচে কে হাঁটছে লক্ষ্য না করে জানালা গলিয়ে তুলার ব্যাণ্ডেজ, ভাত, ডাল, আনাজের খোসা

মাছের কাঁটা ছুঁড়ে ফেলে। প্রতাপের মাথায় দু'একদিন পড়েছে। কিন্তু উপায় নেই বলে মাথা নিচু করে সে হেঁটে বেরিয়ে যায়।

কিন্তু বুটকি ছুটকির মাথায় আজ পর্যন্ত কেউ কিছু ফেলতে পারেনি। ইচ্ছা করেই কেউ এসব ফেলছে বুটকি ছুটকি খুব ছোট বেলা থেকে তা জেনে গেছে বলে এগুলো এড়িয়ে যায়, যেতে পারছে আজ এতটা বয়স পর্যন্ত।

কেননা উচ্ছিষ্ট ফেলার সময় দু'একজোড়া আগ্রহের চোখ নাচানাচি করে ওপরের দিকের ঘরের দু'একটা জানালায় টের পাবার পর থেকে বুটকি ছুটকি খুব সাবধানে এই অন্ধকার গলি পার হতে শিখল।

দু'বোন এখন দাঁড়িয়ে একদিকে ঘৃণা আর একদিকে লালসার অভিশাপ মেশানো রাস্তাটা দেখে তেমন আঁতকে ওঠে না। সেই বয়স অনেক দিন পার করে এল ওরা। বরং কানাগলির কথা ভুলে থেকে দু'জন অদূরে আলোয় নাওয়া বড়গলির অংশটাই এখন বেশি দেখে। ওটার কথাই এখন বেশি মনে পড়ে দু'জনের।

ছোট বেলায় মা'র আদেশ মত লঙ্কা হলুদ বার্লি সাবান কিনতে ওখানেই ছুটে গেছে দু'বোন। একটু বড় হয়ে পুতুলের কাপড় আর রেলগাড়ির জন্য দেশলাইয়েব খালি বাক্স যোগাড় করতে সারাদিন ওই রাস্তায় কাটিয়েছে। আর একটু বড় হয়ে ফাটা চুড়ি আর রংচটা রিবন কুড়িয়েছে ঘরে ঘরে। তারপর আর যায়নি।

তারপর একদিন বড় হয়ে বেরিয়ে লোভ করতে গিয়ে দু'জন বিপদে পড়েছিল। মানিকের দেওয়া ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প দু'টো।

ঘরে দেখতে পেলে (কাজে না লাগিয়ে তুলে রাখলেও) প্রতাপ ভীষণ বিরক্ত হ'ত। রাগারাগি করত। 'মাগনা ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প তোদের ও দিতে গেল কেন! তোদের সঙ্গে ইলেক্‌ট্রিকের দোকানের মানিকের কী সম্পর্ক!'

সম্পর্ক কিছুই নেই কথাটা এতবড় দুই মেয়ে বাবাকে

বোঝাতে পারত না। সন্দেশটা অবশ্য খাওয়া হয়ে গেছল, তাই ওই নিয়ে কথা হত না।

বুটকি ছুটকির কাঁধে হাত রাখল। 'চল, ঘরে যাই। দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে।' ছুটকি বুটকির কাঁধে হাত রেখে রক ছেড়ে ঘরে ঢুকল।

এতটুকুন একটা কোঠা। তক্তপোষ একটা। ছোট। প্রতাপ শোয়। ছুটকি বুটকি মাটিতে। তারা যে মেঝেয় কি বিছায় ঈশ্বর জানে।

প্রতাপ কোনদিন দেখেনি। দেখতে চায়ও না। মা'র অসুখের সময় বাবা যখন ওদের সঙ্গেই মাত্র এক হাতের ব্যবধান রেখে মেঝেয় শুয়েছে তখন দু'বোনের একটা ছেঁড়া কম্বল ছিল আর বুটকির একটা ছেড়া সায়া ও একটা ছেঁড়া ফ্রকের দু'টো অংশ জুড়ে সেলাই করা কাঁথার মত। একটু ঠাণ্ডা পড়লে দু'বোন সেটা গায়ে দিত, নিচে বিছিয়েছে।

কাঁথাটার হয়ে গেছে কম্বলটার আধখানা মাত্র আছে। তাই কোনরকমে দু'জনে টান করে বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে পড়ল। দু'দিকের দেয়ালে দু'টি মুখ। শুয়ে পড়লে আর কথা বলে না ওরা বড় একটা।

ছুটকির মত বুটকিও তখন ভাবে।

মার অসুখের সময় তার শুশ্রূষা ও সংসারের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় দু'বোন বেশি ভাবত না। সে মন্দ ছিল না। এখন একলা থেকে (মা নেই, বাবা কাজে বেরিয়ে যায়) সব কাজ সেরেও হাঁপিয়ে ওঠে ওরা। যেন সময়ের আর অন্ত নেই। সেই একঘেয়ে লম্বা লম্বা দুপুর।

তবু বাবার খবরের কাগজের অফিসের কাজটা ছিল ভাল। অনেক বই আসত বাড়িতে। রোগশয্যায় শকুন্তলা পড়ত (বুটকি ছুটকির মা), তারা দু'বোন পড়ত; খুব বড় টাইপে ছাপা ও চটি

গল্প হলে এক আধটা বই যে প্রতাপও পড়ে শেষ না করেছে এমন না। সেই কাজ গিয়ে এখন যে ছোটলোক পাব্লিশারের অফিসে চাকরি নিয়েছে সেখানে কেবল কম্পোজিটার বলে না কোনো কর্মচারীকেই বই পড়তে দেওয়ার নিয়ম নেই। তারা বইয়ের ব্যবসা করে।

বইয়ের অভাবটা বুটকি ছুটকি খুব বেশি অনুভব করছিল। তা আবার শকুন্তলা নেই। কেবল তারা পড়বে জেনে প্রতাপ সে-সব বই ঘরে আনত না।

অবশ্য প্রতাপ জানত না যে তার কাজে বেরিয়ে যাবার পর দু'বোন সব বই পড়ে পড়ে শেষ করেছে। শকুন্তলার দৃষ্টিশক্তি শেষের দিকে কমে গেছল। উচ্চারণ করে পড়ে পড়ে আধুনিক গল্পগুলো দু'বোন পালা করে শুনিয়েছে মাকে। টি বি হ'লে মানুষ উত্তেজনা পছন্দ করে। সেই উত্তেজনাকর সরস কাহিনীগুলো শুনে শুনে শকুন্তলার দুর্বল বড় বড় চোখে জল এসে যেত। হার্ট দুবদুব করত। বলত, 'থাক এখন।'

স্কুলে পড়া বন্ধ হয়েছে পর, খেলার সাথী বলতে বাইরের জগতের কেউ রইল না। এমনকি রাস্তায় বেরোনো নিষেধ হয়ে গেছে যেদিন সেদিন বুটকি ছুটকি মাকে মাথা ধুইয়ে খাইয়ে পরিয়ে নিজেরা সামান্য কিছু মুখে গুঁজে বই নিয়ে বসত। লম্বা দুপুরটা সড়াৎ করে জল আসার সময় নিয়ে আসত। টের পাওয়া যায়নি। আবার একটু টুকিটাকি কাজ সেরে শকুন্তলার শুশ্রূষা করে নিজেরা মুখহাত ধুয়ে চুলটুল বেঁধে যাহোক একটা বেশ পরিবর্তন করে শান্ত হয়ে ছোট কম্বলটা মেঝেয় বিছিয়ে তার ওপর পা মুড়ে বসে অসমাপ্ত বইটি খুলে বসত। তখন একটু তন্দ্রা আসত বলে শকুন্তলা শুনতে চাইত না। শব্দ না করে বুটকি ছুটকি গল্প উপন্যাসের লম্বা লম্বা পরিচ্ছেদ পার হয়ে গেছে। রুদ্ধশ্বাসে। কিছু বুঝেছে, কিছু বুঝতে পারেনি। কানাগলির ফাঁপা পাথরের বুকে ক্লাচের ঠুক্ ঠুক্

শব্দ শুনতেই কম্বল গুটিয়ে বইটি লুকিয়ে উঠে পড়েছে। কাজেই প্রতাপের জানবার কথা না।

আজ বই ও মা গিয়ে সময় অচল। অবশ্য বইয়ের চরিত্রগুলো আছে।

বুটকি ছুটকির যখন সময় কাটে না শুয়ে শুয়ে, দেয়ালের বুকে দু'বছর আগের পড়া আধুনিক উপন্যাস-গল্পের চরিত্রগুলোকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে চেয়ে থাকে। এখানে ঘনশ্যাম কবিরাজ লেনের অন্ধকার গলির তেরো টাকা বাড়ির ভাড়াটে প্রতাপ কম্পোজিটারের ঘরে তার সতেরো আঠারো বছরের দুই মেয়ে এদের নিয়ে এত মগ্ন, আধুনিক গল্প লেখকদের তা জানবার কথা নয়।

আর তেমনি লুকিয়ে বুটকি ছুটকি নায়িকাদের পাশে নিজেদের তুলে ধরত।

নায়ক?

ক্লাস সেভেনের পড়া অসমাপ্ত রেখে এই গহ্বরে ঢুকেছে পব বাপ ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ পেল না কথা বলতে মিশতে।

হ্যাঁ, ছিল পুরুষ সামনের গলিতে। তাব আগেই কয়েকখানা বই পড়া হয়ে গেছল। তাই মা বেঁচে থাকতে সেদিন দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে হালুই দোকানে ঢুকে কাঁচাপাকা দাঁড়িভরা গোলগাল মুখ মদনের চোখের ভাষা ও ইলেকৃট্রিকের দোকানের সদ্য গোঁফ ওঠা মানিকদার চোখের ভাষা বুঝতে পারার লজ্জাবোধ নিয়ে দু'বোন আবার এসে ঘরে ঢুকেছিল। বাইরের জগতের সঙ্গে এই শেষ সম্পর্ক। কত বয়স হয়েছিল সেদিন। আর অগ্রসর হয়নি।

'তোদের সতীত্ব তোদের হাতে, মেয়েদের লজ্জা মেয়েরা ঢাকে' ইত্যাদি রকমের দু'একটা কড়া উপদেশ দিয়ে প্রতাপ কাজে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করতে জানত না। জানে না। পারে না। কোনোদিন পারবে কিনা, তাও বেশ বড়টি হয়ে বুটকি ছুটকি এখন

গভীরভাবে ভাবতে শিখেছে। একলা দুপুরে এভাবে ঘরে বসে কাটানোর চেয়ে কোনো (লেখাপড়া শিখল না, অফিসের চাকরির আশা নেই) দোকানে কি কারখানার কাজে ঢুকে পড়লে হয় কিনা একদিন প্রশ্ন করে বুটকি ছুটকি বিপদে পড়েছিল। প্রতাপ বিরক্ত হয়ে রেগে গিয়ে বলছিল, 'এখন মা মরেছে তাই করতে যা, তাই'ত করবি। চাকরি, তার মানেই ভাল ভাল শাড়ি পরা হবে, জুতো হবে, ভ্যানিটি ব্যাগ ঝোলানো হবে, আর বাইরে বেরিয়ে এ-ছোঁড়া সে-ছোঁড়ার সঙ্গে হুটোপুটি। পিঠের হাড় ভেঙ্গে দেব যদি চাকরির কথা মুখে আনিস। খবরদার যা দিচ্ছি, যা খাচ্ছ, তার বেশি লোভ করতে যেও না। তোমাদের মা এই উপার্জন খেয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। আমার সন্তান, কিসে ভাল হয়, কি করলে তোমরা ভাল থাক আমি দেখছি। উঁহুঁ এই বয়সে তোমাদের আমি ঘরের বাইরে পাঠাতে রাজী নই।' বলে রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে মাছের কাঁটা, আনাজের খোসা, তুলাব ব্যাণ্ডেজের জঞ্জাল মাড়িয়ে প্রতাপ কানাগলি পার হয়ে বড় গলিতে গিয়ে উঠেছে। বুটকি ছুটকি ভুলেও আর কোনদিন চাকরির নাম মুখে আনেনি। বাবার শাসন মেনে নিয়ে চুপ করে খেয়ে যাচ্ছে, বড় হচ্ছে। যত বড় হচ্ছে তত তাদের ভয় বাড়ছে, এই আয় সংসারের এই অবস্থা দিয়ে প্রতাপ দু'জনকে শেষ পর্যন্ত কোথায় পাঠাবে!

বিয়ে কথাটা মনে হলেই তাদের চট্ করে ঘরের চেহারা, প্রতাপের মুখ মনে পড়ে যায়। বাবার বেশভূষা! তাদের নিজেদের বেশভূষা। আর খাওয়া! তাই বুটকি ছুটকি চিন্তাটা সেদিকে চালনা করতে ভয় পেয়ে থেমে যায়।

দেয়ালের ছবিগুলো ধরে ধরে অন্য চিন্তা করে ওরা। কোনটা রঙিন, দুঃখের কোনটা, পাপের ছবি, মূর্খতার ভয়ঙ্কর পরিণাম। অসংখ্য চিত্র। তার মধ্যে বুটকি ছুটকি আছে।

ঘনশ্যাম কবিরাজ লেনের কানাগলির সবচেয়ে কম ভাড়ার এই

অন্ধকার ঘরের বাসিন্দা। এ-সব চিন্তায় বুটকি ছুটকির মনে ভয় আতঙ্ক আসা স্বাভাবিক।

'চেহারা ভাল থাকলে বিয়ে আটকাবে না, অই এমনি হয়ে যাবে।' প্রতাপ ঠারে ঠমকে অনেক সময় বোঝায়। 'কিন্তু স্বভাবটি ভাল রাখতে হবে। ওই জিনিসটি নষ্ট করে ফেললে আমি লক্ষ টাকা খরচ করলেও তোমাদের একটিরও পাত্র জোটাতে পারব না।'

দু'বোন কান পেতে থাকে। ক্লাচের শব্দটা ততক্ষণে পাথরের বুকে মিলিয়ে গেছে। তখন বুটকি ছুটকি স্বস্তিবোধ করে। এই চিন্তা ছেড়ে দিয়ে তারা গলি, রিক্সা, ডাকপিওন, গলির ওধারে বড় রাস্তার মত চওড়া জায়গায় দু'পাশে ইলেক্ট্রিক, দর্জি, মনোহারী, বই লজেন্স, পুতুল, কাপড়ের দোকানের চিন্তায় অনায়াসে চলে আসে। বুটকি ছুটকি আবার ছোট হয়ে যায়। এমন কি শকুন্তলার, তাদের মা-র এ-ঘরে থেকে যক্ষ্মা হয়ে মরে যাওয়াব কথাও তখন দু'বোনের মনে থাকে না।

চোখের সামনে মানিকের মুখে ভেসে ওঠে। বড় হয়েছে সিগারেট খায়। সন্দেশের দোকানের মদন। দাঁড়ি আরো শাদা হ'য়ে গেছে, চুল পাতলা হ'য়ে মাথা ন্যাড়া হ'তে চলল। সম্ভবত হাতের ঘি মাথায় মুছেই এই অবস্থা হয়েছে মদনের। না হলে,– মদনের বয়স কত স্থির করতে না পেরে দু'বোন অস্বস্তিবোধ করে। কিন্তু একটু পরেই আব একটা কথা মনে পড়ে অস্বস্তি থাকে না। খাঁটি ঘি আর এখন নেই। ভেজিটেবল্ ঘি। মাথায় লক্ষ মণ মাখলেও চুল শাদা হয় না। সুতরাং মদনের বয়স অনেক হয়েছে।

তবু দু'বোনকে সন্দেশ খেতে দিয়ে কেমন রাক্ষসের মত হা করে তাকিয়ে মদন বুটকি ছুটকিকে সেদিন দেখছিল। ছবিটা মনে পড়ে। দু'বছর আগের একটা দুপুরের। কান লাল হয়ে ওঠার সেই সময়টা তাদের বেশ মনে আছে। দেয়ালের দিকে মুখ

করে কাত হ'য়ে কম্বলের বিছানায় শুয়ে বুটকি ছুটকি এক সঙ্গে দু'টো বড় বড় নিশ্বাস ফেলে।

এভাবে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে সময় কাটে। রাত বাড়ে। কিন্তু তা হলেও রাত একটার অনেকক্ষণ বাকি থাকে। বুটকির হাত পা ছুটকির ডান উরু মশার কামড়ে ফুলে উঠেছে। তা বলে আলো আর জ্বালানো হয় না। অন্ধকারেই হাতের আন্দাজে বাক্সের ওপর থেকে মশারিটা দু'বোন টেনে নামায়। তারপর দেয়ালের দড়ির সঙ্গে কোনরকমে জুড়ে দেয়। দরজাটা আগেই ভেজানো হয়ে গেছে।

মশারির ভিতর ঢুকবার আগে ছুটকি ফ্রকটা খুলে ফেলল। বেগ্‌নি ছিট ঘামে ময়লায় কালো রঙ ধরেছে। এখন অন্ধকারে অবশ্য বোঝা যায় না। ছুটকি জামাটা ছুঁড়ে না ফেলে শিয়রের কাছে রাখল। প্রতাপ এলে এক্ষুনি আবার পরতে হবে। বুটকি মশারির ভিতরে গিয়ে শাড়িটা খুলে ফেলল। পুঁটলি করে শিয়রের পাশে রাখল সেটা। ছুটকির ফ্রকের তলার পাতলা জামাটা যেমন ফেটে ছিঁড়ে সহস্রটি হয়ে আছে তেমনি বুটকির শাড়ির তলার সায়াখানা ছিঁড়ে ছিদ্র হয়ে দুর্দশার চরম সীমায় পৌঁছে আছে। বাড়ন্ত শরীর পুরোনো কাপড় সহ্য করতে পারে না। টান না পড়ে তাই সাবধানে সায়াটা হাঁটুর ওপর তুলে বুটকি মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল।

'কি করবি?'

'জল খাব।'

'দাঁড়া আমি খেয়ে নিই।'

ছুটকি জল খেয়ে গ্লাসটা দিদির হাতে ফিরিয়ে দেয়।

ঢং ঢং করে ওপরের দিকের কোনো ঘরের দেয়ালঘড়ি বাজে। বারোটা।

বারোটা থেকে একটার মধ্যেই ওরা ভয় পায় বেশি। এ সময়টা

কাটেন্না। ঘুমও আর আসে না, অবশ্য কোনদিন সাড়ে বারোটায় ও প্রতাপ ফেরে।

না কি সত্যি রাত একটা বেজে যায় বাবার ঘরে ফিরতে। কোথায় কুমারটুলি আর কোথায় বৌবাজার। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যায় বলে হেঁটে আসতে সময় নেয়। জল খেয়ে বুটকি ছুটকির পাশে এসে দাঁড়ায়।

'চল শুইগে।'

'ঘুম আসে না।'

ছুটকি বুটকির পিঠের ওপর হাত রাখে। আবার কি বলতে চায়, কিন্তু বলা হয় না। ছুটকির মত বুটকিও শব্দটা শুনে চমকে ওঠে।

'ইঁদুর।' বুটকি ফিসফিসিয়ে বলল।

ছুটকি মাথা নাড়ল। কানাগলির ফাঁপা পাথর কাঁপিয়ে বড় বড় ইঁদুর ছুটোছুটি করে, জঞ্জাল খুঁটে খাদ্য অন্বেষণ করে। ছোট-বেলা থেকে দুজন দেখে আসছে শব্দ শুনছে কিন্তু তবু গভীর রাত্রে শব্দটা কেমন অদ্ভুত লাগে ওদের কানে। মাঝে মাঝে এক একটা পাথরের তলা ক্ষয়ে নড়বড়ে হয়ে আছে বলে ইঁদুরগুলো যখন ছুটোছুটি করে তখন একটা বিশ্রী ঘড়ঘড় আওয়াজ হয়। যেন ইঁদুরেরা চলে যাওয়ার পরও পাথরগুলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে নড়তে থাকে কাঁপতে থাকে আর হৃৎপিণ্ড ঢুবঢুব করার মতন শব্দ করে।

শব্দটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'বোন চুপ করে পরস্পরের হাত জড়িয়ে ধরে অন্ধকারে দরজার পাল্লাটার দিকে চেয়ে থাকে। সবুজ রেখা। খুব সরু।

এই আলোর রেখাটা আগে ছিল না। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। যখন এ ঘরের আলো নিবিয়ে দেওয়া হয় তখন একটা সরু ফিকে সবুজ রেখা প্রতাপের ঘরে এসে লুটোয়। সম্ভবত পাশের বাড়ির ওপর তলার কোনো ঘরের জানালা থেকে ছিটকে এসে

আলোটা এদিকের ঘরে ঢুকছে। সে ঘরের ছাদে দেয়ালে সবুজ রঙ অথবা আলোর ডোমটা সবুজ। চিন্তা করতে থাকে দু'বোন।

তারপর ছুটকি ফিসফিসিয়ে বুটকির কানে কানে বলল, 'বাইরে যাব।'

'তা অত রাত পর্যন্ত ওটি বাকি রাখিস কেন?' বুটাক বিরক্ত হয়।

এখন আবার কাপড় পরতে হবে। সেই ভেবে বুটকি সন্ধ্যা-সন্ধ্যি ও-সব কাজ সেরে এসেছে।

'থাক্‌গে।' এত রাতে সামনের দরজা খুলতে দিদি রাজী নয় দেখে ছুটকি ভিতরের দিকের নর্দমার পাশে যায়। অবশ্য খুব সতর্কভাবে। বুটকি খোঁপা ঠিক করছিল।

ফিরে এসে আলোর রেখায় ছুটকি দিদির ঘাড়ের সুন্দর বাঁক দেখছিল। শাঁখের মতন সরু হয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে আসা গলা।

সবুজ আলোটা বল্লমের মত খোঁচা মেরে ছুটকির সুন্দর উঁচু বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, পাতলা জামার ছিদ্র দিয়ে, উদ্ধত স্তনের চূড়ায়। একটা চূড়া বেরিয়ে এসেছিল।

ছুটকির চোখ দুটোও কম চিকচিক করছিল না। দিদি এমন করে তাকাতে ছুটকিও বুটকির চোখের দিকে তাকিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেলল।

'কি নিজের যৌবন দেখে আশ মিটছে না, আমাকে হা ক'রে গিলছিস কেন!'

'না,' বুটকি ঘাড় নাড়ল, 'তোকে দেখছি, এমন সুন্দর হয়েছিস তুই দেখতে, না জানি কোন দেশের রাজার ছেলের চোখে পড়বি একদিন—'

'আর বিয়ে করবে, তাই ভাবছিস তো?' ছুটকি হাসল। 'রক্ষা করো বাবা, দরকার নেই রাজার ছেলের, বিনা পণে যদি বুড়ো মদন

হালুই এসে তুলে নিয়ে যায় বাঁচি।' কথা শেষ করে ছুটকি অল্প শব্দ ক'রে হাসল, বুটকিও। রাত্রির স্তব্ধ প্রহরে নোংরা অপরিসর কানাগলির কোণার দিকের এই অন্ধকার গহ্বরে জেগে থেকে ভয় ভাবনা দুশ্চিন্তা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যৌবনবতী দু'টি কুমারী একটু হাসির রঙ মুখে মেখে প্রকৃতস্থ হয়ে উঠতে চেষ্টা করল। কিন্তু কতক্ষণ! খুব বেশি সময় হাসতে পারে না। দেখতে দেখতে আবার বুকচাপা গাঢ় স্তব্ধতা নামল। দু'জন নীরব। এ ওর দিকে তাকিয়ে শুধু ফ্যালফ্যাল করে দেখে। যেন আলোর রেখাটা হঠাৎ বেঁকে নিচের দিকে নেমে বুটকির কোমর, কোমরের নিচের মাংসল মসৃন সুন্দর উরুর ওপব পড়ে চিকচিক করে। ছুটকি সেদিক থেকে চোখ সরায় না। এক মুহূর্ত কি ভাবল ও। তারপর দিদির কাছে সরে গিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে মাটির ওপব বসে দু'হাতে বুটকির উরু দু'টো জড়িয়ে' বুক দিয়ে চেপে ধরল। ভাল লাগছিল বুটকির। এতক্ষণ সিমেণ্টেব ওপর শুয়ে কোমরের নিচটা যেন ঠাণ্ডা অসাড় হয়ে ছিল। আর একটু ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ও ছুটকির বুকের তাপ নেয়। কতক্ষণ কাটে এভাবে। তাবপর এক সময় নুয়ে বোনের মাথাটা ও তুলে ধরল, দেখল সবুজ আলোর রেখায় ছুটকির চোখ একটু বেশি চিকচিক করছে। 'ছিঃ কাঁদিসনে।' বুটকি সান্ত্বনা দেয়। 'আয় শুয়ে পড়িগে। বাবার ফিরতে এখনো দেরি।'

বাইরে পাথরের ঘড়ঘড়ানিটা আবার শোনা যায়। যেন পাথরের মত বোবা হয়ে থাকে ছুটকি। কথা না কয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বুটকির সঙ্গে সঙ্গে মশারির ভিতর ঢুকল।

'জামাটা খুলে ফেলি দিদি।' ফিসফিসিয়ে বলল ও এক সময়।

'এত গরম তোর', বলতে চেয়েছিল বুটকি, কিন্তু বলল না, বরং বলল, 'তা ওটার আছে কি, ন্যাকড়া, খুলে ফেল, বরং বাবা এসে গেলে ফ্রকটাই গায়ে দিস, ওটা মাথার কাছে আছে তো?'

কথা না কয়ে শুধু মাথা নাড়ে ছুটকি, গায়ের ছেঁড়া পাতলা

জামাটা একটানে খুলে ফেলে, তারপর আড়াআড়ি হয়ে বড় বোনের বুকের ওপর শুয়ে থেকে লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলে।

বুটকি আদর করে ওর পিঠে গলায় গালে আস্তে আস্তে চাপড় দেয়। 'আশা, আশা নিয়ে বেঁচে থাক ছুটকি, ওতেও সুখ আছে, আমি তো—'

কথা অসমাপ্ত থাকে। বাইরে ক্লাচের শব্দ। দু'বোন তাড়াতাড়ি উঠে বসে কাপড় পরতে ব্যস্ত হয়।